শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার জাতীয় পত্রিকা

হালখাতা

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০০৯

প্রধান সম্পাদক
শওকত হোসেন

সম্পাদক
শরমিন নিশাত

যোগাযোগ
বাবুল অডিও
১৩৭, আজিজ সুপার মার্কেট, নিচতলা
শাহবাগ, ঢাকা- ১০০০
মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৭২০৫৮৭৭২৭
ই-মেইল: halkhata1971@gmail.com

বানান সমন্বয়
ফরীদুল আলম

পত্রিকার নামলিপি
রবিন আহসান

প্রচ্ছদ
শিল্পী রুহুল আমিন কাজল, ডেনমার্ক প্রবাসী
কবি সাবদার সিদ্দিকীর পোট্রেট অবলম্বনে (সংগ্রহ: রাদ আহমেদ)

কম্পোজ
জাহাঙ্গীর বিপ্লব

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মুদ্রণ
বিকল্প প্রিন্টিং

মূল্য
৫০.০০ টাকা
৫০.০০ রুপি

স ম্পা দ কী য়

কবি সাবদার সিদ্দিকী আঘাত ও বঞ্চনাকেই গ্রহণ করেন পরম হিসেবে; প্রকাশ করেন শিল্পরূপে– কবিতায় ও যাপনে। তাঁকে পাওয়া যায়– কবিতায় যতোটা– তারচেয়েও বেশি যাপনে। রাষ্ট্রের পোষাপ্রতিষ্ঠানে বিদ্যাশিক্ষা নেওয়া সত্ত্বেও কী-করে এই স্তম্ভিত-স্পর্ধা দেখালেন; পরণে চটের বস্তা, গাছতলায় বাস, চোখে সানগ্লাস; হাতে কলম–! কা'র দেয়া কোন্ কষ্টকে অবলম্বন করে প্রতীক করে নিলেন নিজেকে! পেশার মুখে চুনকালি মাখিয়ে কী-বোঝাতে চাইলেন; করুণ-কুকুর-সমাজকে পাল্টিয়ে দেওয়ার কোন্ ফানুস উড়িয়ে দিলেন প্রচণ্ডরাগে; চপেটাঘাতখানি কা'র গালে বসিয়ে চীরহরিৎ ইতিহাস হয়ে বিরাজিত আছেন কী-আশায়– আমাদের এই চারপাশে!

অনেক দিন থেকে ভাবছিলাম কবি সাবদার সিদ্দিকী'র ওপর সংখ্যা করব। ছোট পরিসরে বের হলেও এ-সংখ্যার লেখাগুলো সাবদারকে জানা ও বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। যারা অংশ নিলেন তাদের কাছে আকাশসমান কৃতজ্ঞ। 'ঘাস ফুল নদী প্রকাশনী'র স্বত্বাধীকারী মুনির মোর্শেদ ভাইকে ধন্যবাদ– লেখা সংগ্রহের ক্ষেত্রে তার আন্তরিকতার জন্য।

শওকত হোসেন
শরমিন নিশাত
সম্পাদক, গোলাঘর

সূচি

স্মরণ ০৪

প্রবন্ধ

[গোলাম] সাবদার সিদ্দিকীর কবিতায় রাজনীতি:
আবদুল মান্নান সৈয়দের সঙ্গে বিচার
সলিমুল্লাহ খান ০৮

সাবদার সিদ্দিকী, প্রিয় কবিতা: একটি দায়বদ্ধ ভূমিকা
মনজুরুল আজিম পলাশ ২৫

ভাঙা লিরিকের, ভাঙা বয়ান ১: কবি সাবদার সিদ্দিকী
চয়ন খায়রুল হাবিব ৩০

কবি সাবদার সিদ্দিকী
আলমগীর রেজা চৌধুরী ৪০

গোলাম সাবদার সিদ্দিকী: কোন কাননের ফুল
শহিদউল্লাহ সবুজ ৪৩

সাবদার সিদ্দিকী: পুনর্পাঠ
পুলক হাসান ৪৭

স্মরণ
৩টি ছবি

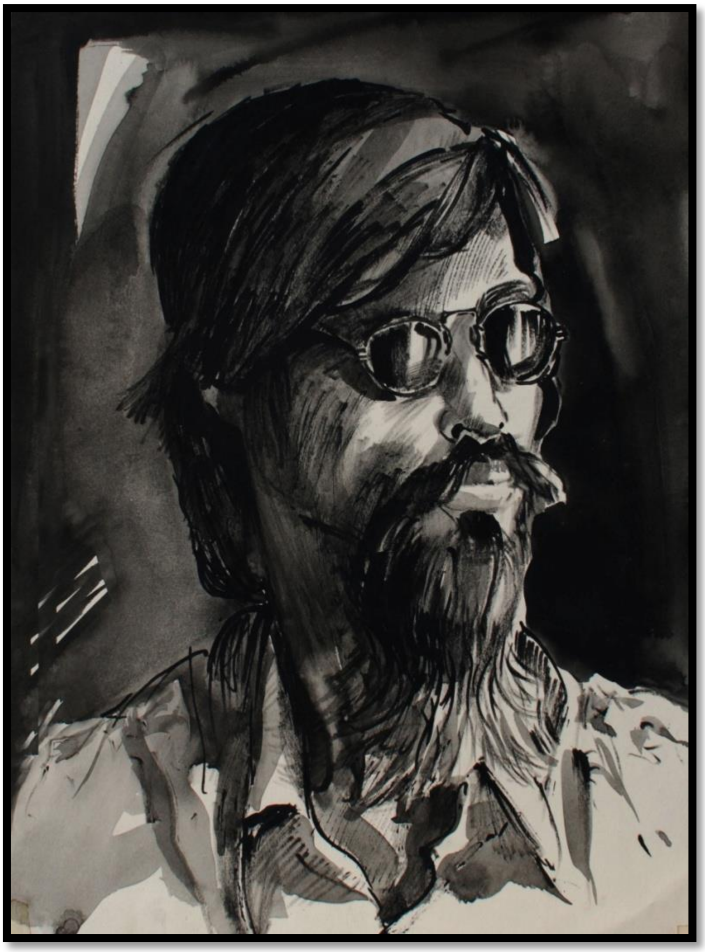

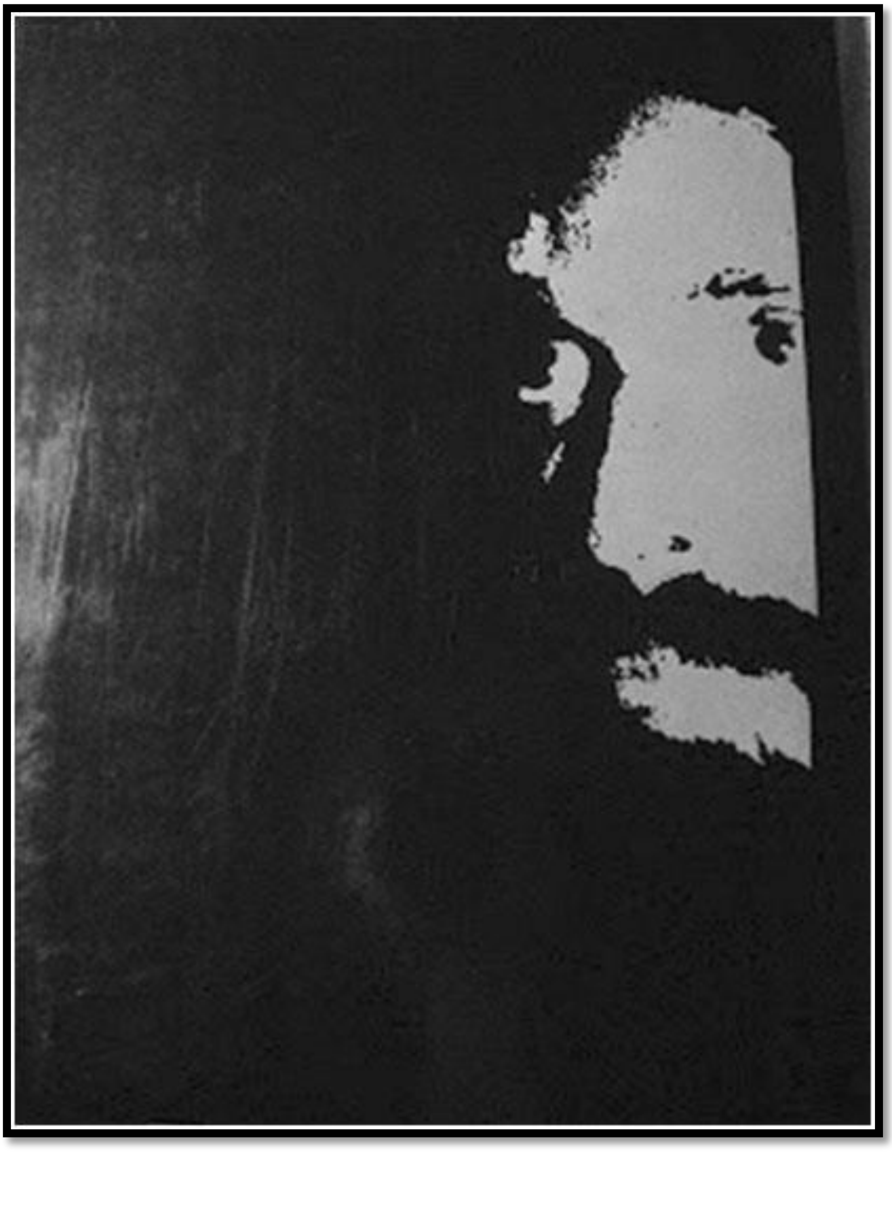

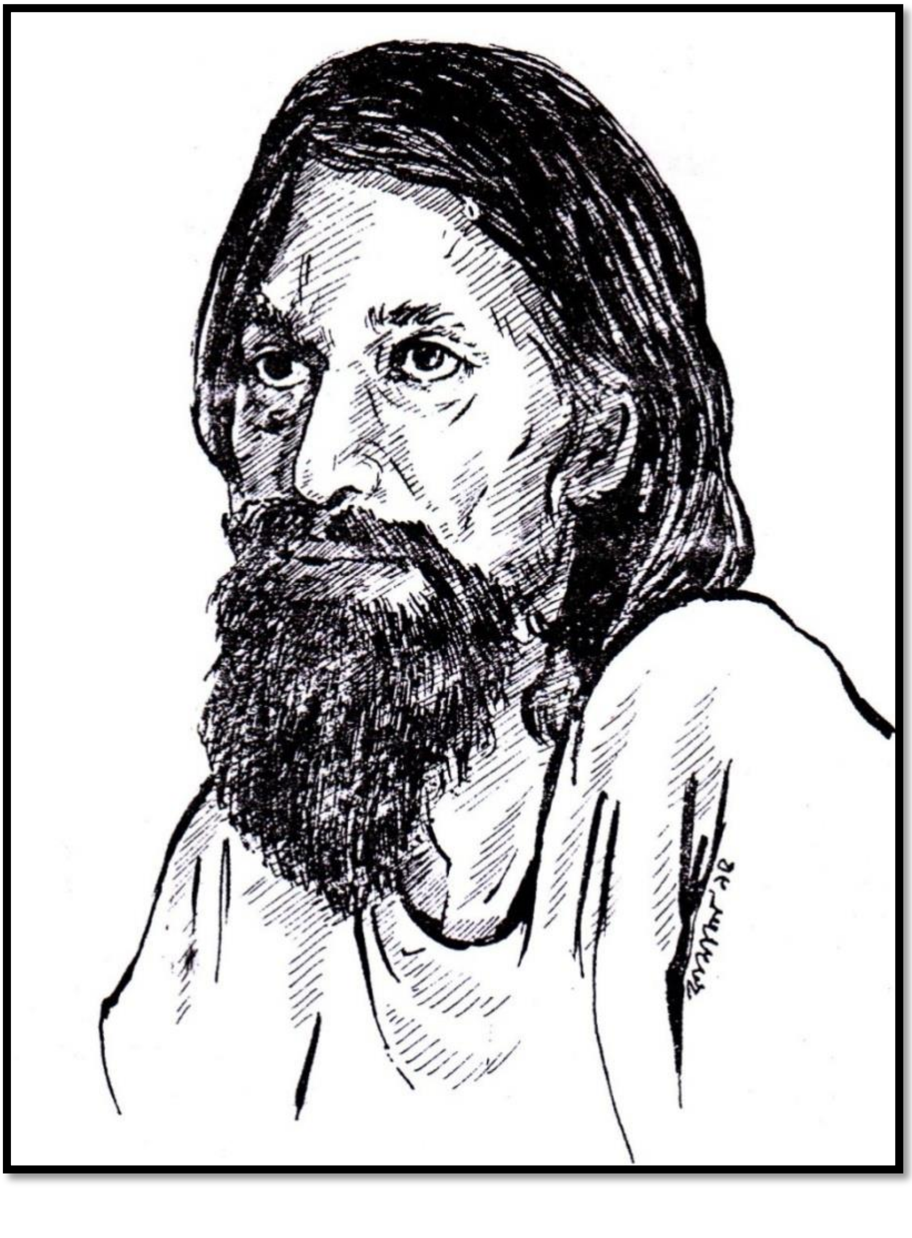

স ং ক্ষি প্ত প রি চি তি

জন্ম ১৯৫০, কোলকাতা। পৈতৃক নিবাস: বশিরহাট, চব্বিশ পরগণা। পিতা : গোলাম মাওলা সিদ্দিকী, আইন ব্যবসায়ী। চার বোন, এক ভাই। সাবদার ছিলেন দ্বিতীয় সন্তান এবং একমাত্র পুত্র সন্তান।

১৯৬৪-তে কোলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে গোটা পরিবার সমেত সাবদার তাঁর পিতার সঙ্গে চলে আসেন বাংলাদেশের সাতক্ষীরায়। তখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। পিতা ১৯৬৪-৭১ পর্যন্ত সাতক্ষীরায় আইন ব্যবসা করতেন।

১৯৭১ সালে পরিবার আবার কোলকাতায় চলে যায়। সাবদার থেকে যান এ দেশে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে সাবদার সিদ্দিকী আট নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেন। পরে কোলকাতায় চলে যান। কোলকাতা থেকে প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক 'স্বদেশ'।

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড : ১৯৬৪ সালে অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে সাহিত্য সংগঠন 'কোরক'-এর সহ-সাধারণ সম্পাদক।

১৯৬৫-র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর সাতক্ষীরা থেকে প্রকাশিত দেশাত্মবোধক কবিতা-সংকলন 'অনন্য স্বদেশ'-এ সাবদারের প্রথম কবিতা প্রকাশিত।

১৯৭০-এ মুক্তিযুদ্ধের সময় কোলকাতা থেকে সাপ্তাহিক 'স্বদেশ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৭২ সালে কোলকাতা থেকে ফিরে এসে সাপ্তাহিক 'স্বদেশ'-এর চারটি সংখ্যা প্রকাশ করেন।

সাবদার সিদ্দিকীর কবিতা-সংবলিত দু-তিনটি ছোট পুস্তিকা বা সংকলন প্রকাশিত হয় : 'পা', 'গুটিবসন্তের সংবাদ', 'সোনার হরিণ' প্রভৃতি।

মৃত্যু : ১৯৯৪। জীবনের শেষপর্বে দিল্লিতে অসুস্থ। অসুস্থতা নিয়ে কোলকাতায় ফিরে আসেন। বাংলাদেশে চলে আসার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিলেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও ফিরে আসার পথে সাতক্ষীরার কাছে বাংলাদেশের সীমান্তে ওপারে মৃত্যু। সীমান্তের নামহীন এক গ্রামে সমাহিত।

প্র ব ন্ধ

[গোলাম] সাবদার সিদ্দিকীর কবিতায় রাজনীতি: আবদুল মান্নান সৈয়দের সঙ্গে বিচার

স লি মু ল্লা হ খা ন

"তোমার আমার গ্রহটা গদ্যময়
জেনেছি সে কথা কাব্যে গদ্যে নয়"
–সাবদার সিদ্দিকী

নামে কী আসে যায়?

সাবদার সিদ্দিকী কবিজীবনের পয়লা ক'বছর' 'গোলাম সাবদার সিদ্দিকী' নামে লিখতেন। এ তথ্য জানিয়েছেন তাঁর একমাত্র এবং মরণোত্তর কবিতাসংগ্রহের সম্পাদক আবদুল মান্নান সৈয়দ। (সৈয়দ ১৯৯৭:৯)

ছাপ্পান্নটি ছোট-বড় পদ্যের এই সংকলনে কবিতাগুলোর রচনা কি প্রকাশকাল নির্দেশের কোনো চেষ্টার প্রমাণ নাই। ফলে সাবদারের প্রায় ৩০ বছরের কাব্যসাধনার বিকাশ বোঝা দুঃখেও সম্ভব হয় না। মহাত্মা আবদুল মান্নানের মতে সাবদার সিদ্দিকী নামের 'গোলাম' অংশটি 'স্বাধীনতার পরে, এক সময়' ছেঁটে ফেলেছেন। কত পরে না জেনে এর কারণ নির্ণয় সম্ভব হয় না।

লেখক-সাধারণ নাম নানা অছিলায় বদলান। আবদুল মান্নান সৈয়দ আরেধারে যা বলতে চেয়েছেন, তার মর্ম আমরা এভাবে গ্রহণ করি। ১৯৭১- এর যুদ্ধ সাবদার সিদ্দিকী ও তাঁর কবিতাকে যেরকম ভিতর থেকে বদলে দিয়েছিল, তাঁর নামকেও খুব সম্ভব তেমনি দেয়। (আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৭:১১)

গোলাম ছাঁটা মানে গোলামি ছাঁটা– এমন ইঙ্গিতই কি মান্নান করছেন? সিদ্দিকীর জীবনী পড়ে আবদুল মান্নান সৈয়দ ওঁর নিঃসঙ্গতার ওপর গুরুত্বারোপের কোশেশ করেছেন। "সমস্তের ভেতরে একটি গহন একাকিত্ব দখল করছিল তাঁকে।" (আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৭:১১) সিদ্দিকীর সংগৃহীত কবিতা পড়ে আমাদের মনে হয়েছে ওঁর মেজাজে ব্যক্তিগত একাকিত্বের অভিযোগ আশ্চর্য বিরল। যাকে সহজ কথায় বলে দেশ ও দশের ভাবনা–চলতি অর্থে রাজনীতি ও সমাজচিন্তাও বলা যায়– তার উপস্থিতি প্রবল

ওঁর কবিতায়। বস্তুতপক্ষে সাবদার সিদ্দিকীর কবিতায় মোটেও নৈরাশ্য নেই, মধ্যম শ্রেণির দুঃখের ফিরিস্তি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, বিলাপ মাতম একেবারে নেই বললেও চলে।

সাহিত্যজীবনের অভিব্যক্তি, সুতরাং লেখকের জীবনীর মধ্যে লেখার অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে ইউরোপে এই মতবাদের বিকাশ হতে শুরু করে। মহাত্মা গ্যেটে প্রমুখ লেখকের হাতে এই সংস্কার প্রায় সত্যের মর্যাদায় উন্নীত হয়। নানাবিধ সমালোচনা সত্ত্বেও এই মতবাদ আজও অমৃত। আবদুল মান্নান সৈয়দের লেখায়ও এর খানিক উত্তরাধিকার দেখা যাচ্ছে। মান্নান লিখেছেন : "কলকাতার কফি হাউজ, ঢাকার আড্ডা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ– সমস্তের মধ্যেই সাবদার সিদ্দিকী ব্যক্তিগতকে প্রবেশ করিয়েছিলেন একটি গহন ছুরির মতো। সেখানে '৫০-এর যে কলকাতা তাঁকে জন্ম দিয়েছিল সেই কলকাতার হাওড়া ব্রিজকে তাঁর মনে হয়েছিল 'লোহার ব্রেসিয়ার', কলকাতাকে মনে হয়েছিল 'সন্ন্যাসীর লিঙ্গের মতো নিস্পৃহ, উদাসীন, নিরাসক্ত' (আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৯৭:১৬)।

মান্নানের মনে প্রশ্ন জাগেনি ব্যক্তি কী– বস্তু নিটোল, অখণ্ড, সমস্যাহীন ব্যক্তি ছুরির মতো কিছু কি? যে ব্যক্তি নিজেকে ব্যক্ত বা প্রকাশ করে সে কিভাবে তৈরি হয়? ব্যক্তির মধ্য দিয়ে আর কেউ, অন্য কিছু ব্যক্ত হচ্ছে কি-না এ সন্দেহ মান্নান সৈয়দের দিগন্তেও নেই।

মহাত্মা গ্যেটে ওঁর আত্মজীবনী –'কবিতা ও সত্য'– শুরু করেছেন জন্মমুহূর্তের তিথিনক্ষত্রাদির জ্যোতিষশাস্ত্রীয় অবস্থানের বর্ণনা দিয়ে। গ্যেটের মতো বৈজ্ঞানিক মেজাজের কবি– যিনি নিউটনের আলোকবিদ্যার মৌলিক বিচার করার যোগ্য– জ্যোতিষীর পেশা নিয়ে ঠাট্টা করার জন্যে তা করেছেন ভাবলে ঠিক হবে না। (ন্যাগেলে ১৯৮৭:২৬)

ব্যক্তির নিখিল অটুট জীবনই তার সৃষ্টির ভাঁড়ার মনে করি আমরা। কিন্তু নিজের জন্ম ও মৃত্যুর কাহিনী জানার সুযোগ কোনো লেখকেরই যতদূর জানি আজ পর্যন্ত হয়নি। গ্যেটেও ব্যতিক্রম নন। নিজের জন্মকথা অপরের মুখে শুনে সবাই লেখেন। গ্যেটেও বলেছেন– তিনিও বন্ধু বেটিনার মুখে শুনেছেন, বেটিনা শুনেছেন গ্যেটের মা'র মুখে। উনিও প্রতিভাশালী গল্প-বলিয়ে ছিলেন।

তিথি–নক্ষত্রের অবস্থানের মতো শিশুর জন্ম থেকে স্মৃতির বয়সে পৌঁছা অব্দি ব্যক্তির ইতিহাস–সংগত কারণেই– আমরা মধ্যস্থ অপরাপর ব্যক্তি ও কাহিনীর মাধ্যমেই জানতে পাই। একইভাবে আমরা যখন ৫০ কি ৬০ বছর বয়সে ছেলেবেলা লিখি তখনও আমরা অপরের গল্প বলতে থাকি। 'আমি' শব্দে যার কথা বলা হচ্ছে সে হয়তো অন্য কেউ। 'ব্যক্তি' হয়তো 'আমি' তে নয় 'তুমি' ও 'সে' তে নিজেকে অধিক ব্যক্ত করছে। যে লোক ভারি আহ্লাদে সারাক্ষণ আমি আমি করে বেড়াচ্ছে– নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতার অতগুলো 'আমি'র কথা মনে করুন সে হয়তো অন্য 'আমি'র ছবি বয়ে বেড়াচ্ছে।

ব্যক্তির জীবনশুরুর পর্বটা যেমন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকে না তেমনি বয়োপ্রাপ্ত পর্বও ব্যক্তিরও নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে যায়, যদিও আমিত্বের দর্পে সে তা টের পায় না

আদৌ। আসলে ব্যক্তি এক নয়, দুজনে বিভক্ত। একজনকে বলা যাক ব্যক্তি, ইংরেজি সাবজেক্ট শব্দে এর অনুবাদ বটে। অন্যকে বলা যাক 'আমি'। গ্রিক ইগো (ego), সংস্কৃত অহম শব্দের তর্জমা।

ফরাসি মনীষী জাক লাকাঁ ফ্রয়েডের পথ ধরে ব্যক্তির জগৎকে বলেছেন সিম্বলিক অর্ডার (symbolic order)। বাংলায় বলা যাক নিশানার জগৎ। অপরদিকে 'আমি'র জগৎ, লাকাঁর মতে, ইমাজিনারি অর্ডার (imaginary order) বা ছায়ার জগৎ। ছায়ার জগৎ থেকে নিশানার জগতে শিশুর উত্তরণ ঘটে ভাষার মাধ্যমে। (লাকাঁ ১৯৭৭) তাই ভাষা নিশানা জগতের উত্তম উদাহরণ। ভাষাই ব্যক্তি তৈরি করে। শুদ্ধ মানুষ হওয়ার কালে নয়, শিশুর সারা জীবনমানই এই গঠন চলতে থাকে। মানুষের মানুষ হওয়ার শেষ নেই।

জাক লাকাঁর এই আবিষ্কার দেকার্তের 'আমি ভাবি তাই আমি' প্রস্তাবের পায়ের তলার মাটি তুলে ফেলেছে। লাকাঁর মতে, আমি 'আমি' নই, আমি অন্য। সেয়ানা অবস্থায় আমি যে বাক্যরাশি অনর্গল উৎপাদন করে চলেছি আমাকে তাতে পাওয়া যায় না, আমার ব্যক্তিকে পাওয়া যায় অন্যের ভেতর। অন্যের কাহিনীরই অপর নাম 'আনকনসাস' (unconsious) বা অবচেতন।

ফকির লালন যাকে বলেন 'অচিন দেশ' তার সাথে এর তুলনা চলে। মান্নান সৈয়দ সাবদার সিদ্দিকীর ব্যক্তিগত ছুরি বলে যাকে শনাক্ত করেছেন তা লাকাঁ–কথিত ছায়ার জগৎ মাত্র। মান্নান এই ছায়াছুরি ঢুকিয়ে দিয়েছেন নিশানার ভেতর। এখানে দেখা দরকার ছায়ার ভেতর নিশানা কিভাবে ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ল।

নামের মহিমা এখানে প্রাসঙ্গিক। ব্যক্তিগতের বন্দনা করতে গিয়ে মান্নান সৈয়দ খাপছাড়াভাবে দুটো ইঙ্গিতও দিয়েছেন যাতে দেখা যায় ব্যক্তির গড়নে কী ভাবে নিশানা ঢুকে পড়ে। সাবদারের কবিতায় সমকালীন জিনিসপত্র আর ক্যালিগ্রাফি দেখে মান্নান সৈয়দ ফরাসি কবি গিওম আপোলিনেয়ারের কথা তুলেছেন। অন্যদিকে সাধারণভাবে ষাটের দশকের 'সময় স্বভাব' সিদ্দিকীকেও স্পর্শ করেছিল বলে কবুল করেছেন তিনি। মান্নান বলেছেন– সাবদার সিদ্দিকী নামের 'গোলাম' অংশটি বর্জন করেন। নাম ছোট করাই যদি উদ্দেশ্য তো বর্জ্যের তালিকায় 'সিদ্দিকী'ও সমান প্রার্থী। তা হয়নি। এই তুচ্ছ তথ্যের মধ্যেও আছে এক মহান কাহিনী।

বিখ্যাত হুমায়ূন আহমদের গোড়ার দিকের এক গল্পে কথিত আছে– 'কয় জেনারেশন ধনী থাকলে মানুষের চামড়া এত মসৃণ হয়!' বাঙালি মুসলমান সমাজে বাবা-মা'র জেনারেশন আমার নাম যেভাবে রাখা হয়েছে, আমি ঢাকা আসতে আসতে সে নাম সেকেলে ঠেকে। এই দ্রুত অপসৃয়মাণ জগতের কাছে পাওয়া নাম নতুন জীবনের জন্যে মানানসই নয়। নাগরী হরফে আমাদের আরবি–ফারসি নাম। বানানের সর্বজনগ্রাহ্য নিয়ম নাই। রামমোহন রায়ের ব্যাকরণের বানান অনুসারে আহমদ ছফা এখনও লিখছেন (রামমোহন ১৯৭৩:৩৭০) কিন্তু শামসুর রাহমান সহোদর ভাইদের শেষ নাম থেকে নিজেকে আকার যোগে আলাদা করলেন। আরবি ব্যাকরণ বাংলায় চলে না, তাই লেখকের নাম মাহমুদুজ্জামান হয় মাহমুদ আল জামান, একই নিয়মে বা

অনিয়মে সেলিম আল দীন। জসীমউদদীন ম এবং উ আলাদা লেখার পর জসীম আল দীন লেখাও সম্ভব। মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানের সুমন সরকার হয়ে আবিদ আজাদে স্থির হওয়া বাংলাভাষী মুসলমানের সামাজিক ইতিহাস। অথবা সাইদুর রহমান-তনয়ের শফিক রেহমান নাম। আবদুল মান্নান সৈয়দ হয়তো প্রথম লেখার আগে সৈয়দ আবদুল মান্নান। আমি যে কতখানি আমি নই, আয়নার ভেতরে দেখা ছবি মাত্র– ইংরেজের ও আমেরিকানের উপনিবেশে, বাঙালি হিন্দু ও পাঞ্জাবি মুসলমানের মারের মুখে আত্মপরিচয় কিভাবে দর্পণের কাঠামোয় গড়ে ওঠে সিদ্দিকীর 'গোলাম' বর্জন তার নবতর প্রমাণ বৈ কি!

চাষি সমাজ থেকে এলিট হওয়ার পথে রেনেসাঁস, আধুনিকতা, সংস্কৃতায়ন, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রভৃতি নানান ছত্রছায়ায় ব্যক্তির মরীচিকা দেখা দেয়। খটকা লাগে অন্য জায়গায়। সাবদার সিদ্দিকীর কবিতা ছবির জগৎ ছাড়িয়ে নিশান জগতে উঠেছে। ক্ষমতাসীন এলিটের কাছে সাবদার নিজেকে একটুও সমর্পণ করেননি। বর্তমান এলিট জগতের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং আর্তনাদের অপর নাম সাবদার। তাঁর 'গোলাম' নাম বর্জন তা হলে কি স্ববিরোধিতা? স্ব বা আমি এখানে ব্যক্তি সাবদারের প্রতিদ্বন্দ্বী।

নিশান জগৎ বলে যেখানে আমরা ঢুকি সেখানে গোলামের মতো আমাদের ছায়া জগতের অনেক কাণ্ডই চাপা পড়ে। এর মধ্যে যারা মিশে যায় তারা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বেঁচে থাকেন। কিন্তু সাবদারের মতন যারা প্রশ্ন তোলেন :

> 'এই ঘুমে ঘুমে বেঁচে থাকার কি দরকার?
> স্বপ্নের সাথে যুদ্ধে যুদ্ধে ক্ষতচিহ্ন বাঁচার?" (সাবদার ১৯৯৭:৬৩)

তাদের সমস্যা আছে। যে শৈশবকে– মায়ের সাথে দৈহিক ঐক্যকে নাড়ি কাটার পর আর একবার কাটা হয় পিতার নামে, সমাজ রাষ্ট্র ভগবানের নামে তার ক্ষতচিহ্ন পুরো সারে না। স্বপ্নের মধ্যে ফিরে আসে। ফ্রয়েড স্বপ্নকে বলেছেন এক কিসিমের আলামত। বিদ্যমান জগতের 'ধর্ম-অর্থ-মোক্ষ-কাম' স্বর্গত্যাগের সময় কিছুই ছিল না। স্বর্গ ছবির জগৎ। ধর্ম-অর্থ-মোক্ষ-কাম নিশান জগতের বাসিন্দা। কিন্তু ঈশ্বর শব্দ উচ্চারণ মাত্রেই ছবির জগৎ শেষ, স্বর্গত্যাগের আদেশ জারি হয়ে গেছে। স্বর্গে ঈশ্বর নেই। ঈশ্বর আছেন ভাষায়।

> "স্বর্গ ত্যাগের সময় কি কি ছিল মনে আছে?
> ধর্ম-অর্থ মোক্ষ-বনাম
> ছিল না কিছুই
> কেবল নিঠুর ঈশ্বর–বৃক্ষ–মাটি তুমি আমি।" (সাবদার ১৯৯৭:৩৮)

দুই.
নিশান জগৎ

বিপ্লবী ও সুররিয়ালিস্ট কবি পাবলো নেরুদা সম্পর্কে সাবদারের টান ছিল, বিপ্লবের ও স্বপ্নের প্রতি ওঁর মুগ্ধতা ছিল। এ কথা উল্লেখ করার পর মান্নান সৈয়দ বেহুদা সিদ্ধান্ত করলেন : 'তবে সাবদার কখনোই শ্লোগানধর্মী বা ইজম-তাড়িত কবি ছিলেন না– বরং

নিষ্ঠ ছিলেন কবিতার আঙ্গিকের প্রতি।' (আবদুল মান্নান ১৯৯৭: ১৫) আঙ্গিকনিষ্ঠার সাথে ইজম-তাড়নার কোনো বিরোধ নেই। মান্নান সৈয়দ এরকম বিরোধকে ধরে নিয়েছেন স্বতঃসিদ্ধ। বিপ্লবী ও সুররিয়ালিস্ট পাবলো নেরুদার কথা বাদ দিন, সুররিয়াল-ইজমের 'পোপ' নামে খ্যাত আঁদ্যো ব্রঁতো'র সাথে সম্যক পরিচয় না থাকার প্রমাণ হিসেবেও মান্নানের এই উক্তিকে গ্রহণ করা যায়। (ব্রঁতো ১৯৯৩)

সাবদার সিদ্দিকীর ভেতরে ব্যক্তির বিভাজন এবং ছায়ার জগতের সাথে নিশান জগতের সম্পর্ক ও বিরোধ মান্নানের চিন্তাশক্তির সীমানায় উঁকিও দেয়নি বলেই তিনি সাবদারের কবিতার রাজনৈতিক চরিত্র বুঝতে সম্পূর্ণ অসফল হয়েছেন। প্রভাবশালী সমালোচক হিসেবে মান্নান অনেক তরুণ লেখককে এখনও অনুপ্রাণিত করেন। সিদ্দিকীর যারা অনুরাগী পাঠক-পাঠিকা তাদের অনেকের রিভিয়ু পড়েও আমাদের এ ধারণা পোক্ত হয়েছে।

মান্নান সৈয়দ খানিক নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নাকচ করে আর এক জায়গায় স্বীকার করেছেন সাবদার সিদ্দিকী কিছু দ্রোহের কবিও বটে। এর দায় ষাটের দশকের। মান্নান সৈয়দ লিখেছেন : 'বাংলাদেশের কবিতায় ষাটের দশক একটি দ্রোহের দশক। এই দ্রোহ ছিল কবিতার বিষয় ও বিন্যাস দু দিক থেকেই।' (আবদুল মান্নান ১৯৯৭ : ১৬)

সাবদারের জীবনসারাংশ মান্নান সৈয়দ পেশ করেন এভাবে : 'জন্মেছিলেন কলকাতায়, সাতক্ষীরায় কেটেছে কৈশোর ও প্রথম যৌবন। সাহিত্যিক বিকাশ ঢাকা-র কেন্দ্রিকতায়; সংসার পাতেননি। এমনকি কোনো নারীর সঙ্গে লিপ্ততার কথাও শোনা যায়নি কখনো; গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে কোনো স্থায়ী জীবিকা অবলম্বন করেননি– না চাকরি, না ব্যবসা; কবিতা বা ক্যালিগ্রাফি রচনা করেছেন অনেক, কিন্তু দু'একটি নিউজপ্রিন্ট-নীলচে পুস্তিকা বাদে কোনো পুরু মলাটের শক্ত বাঁধাইয়ের বই পর্যন্ত বেরোয়নি; কোনো রাজনৈতিক দলের ধামা ধরেননি, কোনো কবিসংঘের সদস্য হননি, ধার ধারেননি কোনো ইজমের : স্বতন্ত্র স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত এক জীবন যাপন করে গেছেন, স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীন স্বতন্ত্র এক কবিতাধারা উৎসারণ করে গেছেন।' (আবদুল মান্নান ১৯৯৭:৯)

সাবদার সিদ্দিকীর জীবনী ও কবিতাকে মান্নান সৈয়দ যে পরস্পরের আয়না জ্ঞান করেন তার নিদর্শন 'স্বতন্ত্র' 'স্বাধীন' 'স্বতঃস্ফূর্ত'- এই তিন গুণপদের বিন্যাসক্রম নজর করলে টের পাওয়া যায়। সাবদারের জীবনী যতটা সৈয়দকে টেনেছে, কবিতা যদি তার সিকিটাও টানত তো সাবদার সিদ্দিকীর স্বতন্ত্র কবিতার অন্য এক পরিচয় ফুটে উঠত। আমার সিদ্ধান্ত : সাবদার সিদ্দিকী পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত রাজনীতির কবি। ইজম-তাড়িত নন, ইজম-তাড়ুয়া কবি সাবদার। তিনি শ্লোগান লেখেন ঢের। সাবদার সিদ্দিকী স্বর্গত্যাগের পর থেকেই সিম্বলিক অর্ডারের কবি।

সিম্বলিক অর্ডার বা নিশান জগতে সাবদারের প্রবেশ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভেতর। এ বেদনাকে, এ যন্ত্রণাকে তাঁর 'খানিকটা হলেও, স্বরচিত ও স্বযাচিত' (আবদুল মান্নান ১৯৯৭:১৬) বলা একমাত্র সৈয়দের মতো কল্পনা প্রতিভাবানের পক্ষেই সম্ভব। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতন ঘটনাকে সচরাচর রাজনীতির অঙ্গ বলেই গণ্য

করার রেওয়াজ। ১৯৫০ সনে যে শিশুর জন্মচিৎকার দাঙ্গামথিত কলকাতা শহরের বিবেকের মতো বাতাসে ধ্বনিত হয়েছিল, সে চিৎকারকে মান্নান কি খানিক স্বরচিত বলবেনই?

‘কলকাতা তোমার মনে নেই? মনে নেই?
পঞ্চাশের কলকাতা?
দাঙ্গামথিত শহরের বাতাসে ধ্বনিত
বিবেকের মতো তোমার, আমার জন্মচীৎকার?
কিংবা ‘৬৪ দাঙ্গামথিত শহরের
নগ্নভগ্ন মৌলালীর উলঙ্গ দরগাহ
(সিদ্দিকী ১৯৯৭:১৭)

অথবা

রাজপথে নিঃসঙ্গ সুনীল ভগ্ন শঙ্খের
নিঃশব্দ নিনাদ?
.. ..
তখন কলকাতা
জব চার্ণকের নয়
রবীন্দ্রনাথের নয়
তখন কলকাতা মানে আগুন
তখন কলকাতা মানে আমি
(সিদ্দিকী ১৯৯৭:১৭)

অথবা

‘মধ্যরাতে দাঙ্গার মাতাল চিৎকারে
নিঃসঙ্গ প্রদীপের মতো
কেঁপে ওঠা আমার কিশোর কলকাতা।’
(সাবদার ১৯৯৭:১৭)

‘কলকাতা/আমি এক তরুণ মহাপুরুষ’ নামধারী পদ্যটির শুরু কলকাতা শহরে পাতাল রেল চালুর খবর থেকে :

‘তোমার ভূগর্ভে প্রবাহিত হবে লৌহশব্দ নদী
তোমার পাষাণ বুকে, সংযোজিত লৌহ হৃদপিণ্ডে
ধ্বনিত স্পন্দিত হবে যন্ত্রের জয়গান’
(সাবদার ১৯৯৭:১৭)

স্মৃতির সে ঘরটা ঘুমিয়ে ছিল, পাষাণপুরীর রাজকন্যার মতন জেগে ওঠে সে :

‘কলকাতা, তুমি তাই সুড়ঙ্গগামী আজ
লজ্জায় লুকাতে চাও তোমার কঙ্কাল-মুখ
লক্ষ লক্ষ সতীর ভস্মাচ্ছাদিত
তুমি এক ভণ্ড কাপালিক কলকাতা।

প্রত্যহ বিধৌত তুমি তাই গঙ্গাজলে
তুমি আজ মুখ লুকাতে চাও কোন মুখে? (সাবদার ১৯৯৭ : ১৮)

কবির জীবনী থেকে তাঁর রচনা বাদ দেয়ার পর যা বাকি থাকে, আমার ধারণা মান্নান সৈয়দ তারই চর্চা করেছেন। আগেই বলেছি মান্নান সাবদারের কবিতাকে ব্যক্তিগতের গহন একাকিত্বে নামিয়ে দিয়েছেন এবং নিজের এই অলীক পাঠের লগে যেসব অক্ষর মেলে না তাদের গা করেন নাই।

'হাওড়া ব্রীজ যেন লোহার ব্রেসিয়ার তোমার
কলকাতা, যন্ত্রের সমান বয়সী তুমি
কলকাতা, তোমার ইতিহাস
বাইবেলের পেছনে গাদাবন্দুক
বাংলা গদ্যের সমান বয়সী
আমার কিশোর কলকাতা
সন্ন্যাসীর লিঙ্গের মত নিস্পৃহ তুমি আজ।' (সাবদার ১৯৯৭ : ১৯)

এই থোকাটির কথাই ধরুন। মান্নান সৈয়দ ব্যক্তিগতের বাঁধিগৎ হিসেবে এর ১ নং ও ৭ নং লাইনের শাক ব্যবহার করেছেন। কিন্তু 'বাইবেলের পেছনে গাদাবন্দুক' এই তিন মাছ তাতে পুরো ঢাকা পড়েনি। কলকাতা একদিকে কলোনি শহর, তিনশ বছর তার উমর হল ১৯৯০ সনে। আজ বাংলা ভাষায় বড়লোকের সাহিত্য রাজত্ব করে। তার ঔরস কলকাতায়। কলকাতা মরে যায় বলে কী তুলকালাম না ঘটালেন দিল্লির সাবেক শাহ রাজীব গান্ধী। কিন্তু কী অপরাধ কলকাতার?

ইংরেজ যখন পয়লা বাংলা প্রদেশের পূর্বাংশ ও আসাম কলকাতা থেকে আলাদা করে সরকারি দরকারে, তখন কলকাতার এলিট রাস্তায় নেমেছিল রাখির সুতো হাতে, ভালোবেসেছিল সোনার (আঁশের পূর্ব) বাংলাকে। সেই এলিটই কি ১৯২৬ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত রাখির বদলে কিরিচ নেয়নি হাতের রাখি কাটার?

নিজের কলজে ত্রিশূলে গেঁথে সে-ই কি হল্লা করেনি রাজপথে, পঞ্চাশের মধ্যরাতে, চৌষট্টির বাতাসে? দেশভাগের মূল্য কলকাতাকে দুভাবে দিতে হয়। দিল্লির লাড্ডু খেয়ে পস্তাতে হয় জব চার্নকের শহরকে। পূর্ব দেশের জমিদারি হারিয়ে বসতে হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলকাতাকে। হুগলিপারের চটকলে কাউয়া হাগে। বাংলা গদ্যের লিঙ্গান্তর সংকট দেখা দেয়। নকশালবাড়ির লাল আগুনের পর কলকাতার গদ্য ও পদ্য হ্যামলেটের মতন ধন্দে : কলকাতা, না না-কলকাতা?

'তোমার যাদুঘরে সংরক্ষিত মমির মতো
বড়ই নিঃসঙ্গ আমি আজ।' (সাবদার ১৯৯৭ : ১৮)

'অথচ পার্ক স্ট্রীটের কাঁটাতারে আবদ্ধ
তোমার পাথর গান্ধী
ধাবমান অশ্বারোহী সুভাষ
বিবেকানন্দের গৈরিক নাগরিক কলকাতা

আজকাল কেমন আছ?
দাবার মন্ত্রী তোমার মনুমেন্ট
কলকাতা ওহঃ ওহঃ কলকাতা
চেক! চেক! তুমি চেক' (সাবদার ১৯৯৭ : ১৮)

কলকাতার পতনে সাবদার বলেন, 'আমিও কেঁদেছি।' কলকাতা ক্রমশ একটি কেরানির শহর হয়ে যাচ্ছে। 'ইয়ং বেঙ্গলের হুররে হাহহা' এখন 'কৃষ্ণের বাঁশির মতো হাতে পাইপগান' নিয়ে ঘুরছে : "পকেটে 'পেটো'।" কিন্তু শেষ নেই কলকাতার :

'কলকাতা তুমি বেঁচে গেছ
ডেলি প্যাসেঞ্জারের মুষ্ঠিবদ্ধ হাতে
রেলের বগীতে অথবা ট্রামে
কিংবা নির্জন গ্রামে
কেরানীর রুটির আর আলুভাজির ভাঁজে
তুমি বেঁচে আছ, বেঁচে গেছ। (সাবদার ১৯৯৭ : ১৮-১৯)

তিন.
রুটির বদলে জলমাটি

'জাপানী কাপড়ে ঢাকা
হে আমার ঢাকা' (সাবদার ১৯৯৭ : ২৮)

সাবদার সিদ্দিকী আপাদমস্তক রাজনীতির কবি। আমার এই সিদ্ধান্তের পক্ষে আরেক নজির মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত সংগ্রহের দীর্ঘতম পদ্য 'খসড়া কবিতা।' (সাবদার ১৯৯৭ : পৃ. ৬১-৬৪) আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ওফাতের পর ফরহাদ মজহার একটি স্মরণীয় কবিতা লিখেছিলেন গত বছর (ফরহাদ ১৯৯৭) বাংলা ভাষার আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সাহিত্যে ওটিই 'খসড়া কবিতা'র নিকটতম তুলনা। কী লিখেছেন সাবদার?

'মেডিন জাপান সভ্যত
দ্রুততম টয়োটার পিছে দ্রতগামী মিটসুবিশি
পিছনে ফক্সওয়াগন আর ফোর্ড ডিজেল ট্রানজিট
ভিলাই ইস্পাত ভেল্কি
ঠা ঠা কুট বৈশ্যহাসি টা টা ট্রাক।
নিয়ন্ত্রিত অন্ধকার শীতাতপে টোয়েন্টিয়েথ
সেঞ্চুরী ফক্স!'
(সাবদার ১৯৯৭ : ৬১)

অর্থশাস্ত্রের শিক্ষকরা এই বস্তুর নাম রেখেছেন 'নতুন ঔপনিবেশিকতা'– যার প্রধান বৈশিষ্ট্য গরিব দেশের বাজারে শিল্পোন্নত দেশের প্রস্তুত পণ্য বিক্রয় করা, তার মগজ ধোলাই রাখা। উপরের ছয় লাইনে সাবদার যে সারমর্ম লিখেছেন তা একদিকে ছবির মতন অন্যদিকে নিশানের চেয়েও ভারি নিশান। 'মেডিন জাপান সভ্যতা' নবীন ঔপনিবেশিকতার নতুন নাম।

নয়া জমানার উপনিবেশবাদের স্বভাব এরকম। আজ বাংলাদেশে ফ্রি মার্কেটের উকিলগণ যে অর্থনীতির প্রবর্তন করেছেন তাতে শিল্পকারখানার পথ সংকীর্ণ– আমদানি ব্যবসার পথ বড়। দেশের গরিব দশা অকারণ নয়। এর পেছনে ঔপনিবেশিক যুগের অবদান আছে। নতুন যুগটাও সেই স্মৃতির অধিক হয়ে ওঠেনি।

'তুমি কি জান না যুবক
বিভক্ত স্বদেশে শস্যের চতুর্ভুজ তোমার
বিমান বন্দরে বাদের মেহনফ
নী বন্দরে বমি করে বিদেশী থাবার জাহাজ
রুটির বদলে কিনে নেয় জলমাটি তোমার সবার।'

(সাবদার ১৯৯৭ : ৬১)

মান্নান সৈয়দ, তদীয় সাহিত্য পরিবার ও পেশাদার অর্থনীতির পণ্ডিতদের এই পদ্য, বাংলা ব্যাখ্যাসহ, দৈনিক দুচামচ সেব্য।

'অমীমাংসিত দারিদ্রসীমার
ফারেনহাইট ওঠানামা যাবতীয় রক্তচাপ সমুদ্রসীমা
তুমি কি জান না
এই সব সামাজিক-সামরিক লজিক ম্যাজিক।'

(সাবদার ১৯৯৭ : ৬১)

বাইবেলের পেছনে গাদাবন্দুক যেমন কলকাতার ইতিহাসের চুম্বক, তেমনি আজ 'নিউট্রন মানে না দেশ মহাদেশ' :

'তোমার হাতে দাঁতে লেগে আছে
সবুজ মাংস শস্য কণা।
ঝকমকে টিনজাত সভ্যতা এই উপজাতীয় দামামা
এ্যালুমিনিয়াম মিগ কিংবা বোমা'

(সাবদার ১৯৯৭ : ৬২)

ইংরেজের বাংলা জয়ের পেছনে বাংলার ভগবান সমাজের দান কম নয়। মোগল মনসবদার মীর জাফর, সওদাগর জগৎ শেঠ আর জমিদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে বাদ দিয়ে ইংরেজ সেনাপতি (সাবিৎ জঙ্গ ওরফে) কর্নেল ক্লাইভের গাদাবন্দুক একা হয়তো কলকাতার 'আলিনগর' নাম বদলাতে পারত না। (রজকান্ত ১৯৯৪) ঔপনিবেশিক শোষণের সহায়ক নব্য রাজপুরুষগণ এখন কী হালে আছেন?

'বার্থডে কেক আলোকোজ্জ্বল দ্বীপপুঞ্জরাজি
সুখাদ্য সামরিক আমলা টেবিলে
ক্ষুধার্ত জনতা রুটি দিয়ে বানিয়ে চাঁদের রঙিন ঘুড়ি
বেসবল খেলছে চর্বি ছায়াপিণ্ডরা
হাসছে খেলছে খলখল।
... ...
ঘুরছে বন বন রাজনীতি হুইল চেয়ার

মসলিন রক্তকরবীর তন্তুবায় সম্প্রদায়
আমলা সংস্কৃতি, ভোজবাজি বারোভাজা
মিশ্র অর্থনীতি
রঙিন টিভি টিউবে কূট করমর্দন দোলায়'
(সাবদার ১৯৯৭ : ৬২)

এই ভদ্রলোকেরাই এখন 'সুশীল সমাজ' নামক অশ্লীল শব্দের কারবার চালু করেছেন। এঁরাই ক্ষুদ্রঋণের প্রেরিত পুরুষ, এঁরাই প্রযুক্তির নামে শুল্কহীন বন্দরে কুমির আমদানির ইন্ডেন্টার। এই (বাজার সরকার প্রকাশ) কমপ্রাদোরদের ডেকে সাবদার বলেন :

'সামরিক ও বেসামরিক প্রযুক্তি উৎকর্ষ করতে পারে
তোমাকে উৎফুল্ল উদভ্রান্ত যুগপৎ বিশ্ববিজ্ঞানের
অভ্রান্ত অবদান ভেবে সাহায্য স্বস্তি পাও
হয়তো তুমি।'
(সাবদার ১৯৯৭ : ৬২)

দুনিয়াজুড়ে এখন পুঁজির বিজয় দিবস। পুঁজির ধর্ম নিজেকে বড় থেকে আরো বড় করা। পুঁজির এই আত্মস্ফীতিপরায়ণতা প্রেমের ছদ্মবেশে কামের মতন। কামেরও শেষ নাই, পুঁজিরও তাই :

'তোমার মূল্যমান জীবনের চেয়েও চঞ্চল পেট্রল-এ্যালকোহল
রঙিন আন্ডারওয়্যার ট্রাউজার, ছেঁড়া কাঁচুলি
রাবারের পাহাড় ছেঁড়া ব্রেসিয়ার
সুগন্ধি পাউডার?
(সাবদার ১৯৯৭ : ৬১)

পুঁজির এই প্রবণতা উপনিবেশে এসে তার ঘরের মুখোশ শত্রুর কেল্লার মতো ভুঁয়ে ফেলে দেয়। সাবদার সিদ্দিকীর ধারণা 'পিকাসোর চেয়ে ক্ষিপ্র আঙুল পকেটমার এখানে' পুঁজিওয়ালারা।

'উড়ন্ত সসার পেট্রোডলার
লালরক্ত কালোবাজার
রঙিন-ব্রার মধ্যে গ্রেনেড গোপন।
ছেয়ে থাকা সর্বত্র বিদ্যুৎ বৃক্ষলতা'
(সাবদার ১৯৯৭ : ৬১)

পুঁজির ধর্ম মুনাফা বৃদ্ধি। মুনাফার প্রয়োজনে কাজ সৃষ্টি। অনুন্নত তথা পরাধীন দেশে এই মুনাফার প্রতিযোগিতা আরও বেআব্রু রূপ ধারণ করে। গণদারিদ্র্য ও গণবেকারত্বের দেশে আন্তর্জাতিক (বৈদেশিক) পুঁজির পরামর্শ শিল্পকারখানার পথ গ্রহণ নয়, জন্মনিয়ন্ত্রণ :

'আকাশ আড়াল করা
জন্ম নিয়ন্ত্রণের পিচ্ছিল বিজ্ঞাপন মিছিল'
(সাবদার ১৯৯৭ : ৬২)

আধুনিক ধনতন্ত্র বিমূর্ত ফ্রি মার্কেট নয়– এর যাকে বলে ‘খেলার প্রতিভা’ আছে– ইংরেজিতে বলে ‘রুল অব দি গেইম’। কিন্তু প্রতিভা খেলা মাত্র নয় :

’রেফারীর পাশ পকেটে ভীষণ এখানে
হলুদ লাল কার্ড হিব্রু হুইসল গড়ায় গোল
স্টেডিয়ামে ঘড়ির চেয়ে চঞ্চল বল।’ (সাবদার ১৯৯৭ : ৬২)

হুইসলের বিশেষণ ‘হিব্রু’ কেন? ধনতন্ত্রের ইতিহাসে সাবদারের যথেষ্ট পড়ালেখা আছে বলেই মনে হয়। বাংলাদেশের ধনতন্ত্রের বর্তমান ছবি সাবদার ছোট ছোট ডাকটিকিটের মতো আঁকেন। চিংড়ির ঘেরকে বলেন ‘জলের খামার’, ‘মাছের ভ্রাম্যমাণ যৌথ যৌন সংগঠন’। কৃষি ‘দোঁয়াশ জমিতে কৃষকের ঘাম সেচ প্রকল্প’।

‘উপশহর পেরিয়ে কয়েক কিলোমিটার পেট্রোকেমিকেল
দ্রুত নিঃশেষিত কার্বন মনো অক্সাইড...
...রাডার নিয়ন্ত্রিত আকাশ সীমায়
ইউরো পাউন্ড বুলেট প্রুফ কাঁচ...
(সাবদার ১৯৯৭ : ৬৩-৬৪)

চার.
নির্বাক মুখোশজীবী সম্প্রদায়

নতুন ঔপনিবেশিক যুগে পুঁজির সেবায়েত কারিগর ও ইঞ্জিনিয়ারদের করুণাময়ের মতো জিজ্ঞেস করেন কবি :

‘...বাবুই বাসার নিচে আলোপোকা
অন্ধকার, এবং তার উপরে
আবার অন্ধকার
কত সেন্টিমিটার সৌর অন্ধকার জ্বালাতে পারে
এই বুনসেন বার্নার?’
(সাবদার ১৯৯৭ : ৬৩)

এঁদের বিদ্যায় কবির আস্থায় :

‘বিজ্ঞান পৃথিবীর ধূলিপরমাণু নুড়ি নক্ষত্র কণা
এখনো কিছুই জানে না না জান না সৌর বুরো টেকনোক্র্যাটিক
ক্লিক প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির রকেট বৈজ্ঞানিক।’
(সাবদার ১৯৯৭ : ৬৪)

মধ্যম শ্রেণির নিশান দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কী প্রচণ্ড উপহাস তাঁকে।

‘তুই কি জানিস না চন্দন
নতজানু জানতে চায় এরা
কম্পিউটার কাছে
ঈশ্বর নেই কিংবা আছে
প্রথম দিনের সূর্য নিরুত্তর

কম্পিউটর
দেয় না এদের উত্তর।'
(সাবদার ১৯৯৭ : ৩৬)

মধ্যম শ্রেণির লেখক-কবিদের কর্মকাণ্ডকে সাবদার চিহ্নিত করেছেন 'চঞ্চল কিছু কিলবিল শব্দের কুটিল কুটিরশিল্প' বলে। অথচ আবদুল মান্নান সৈয়দ– ক্ষমাহীন অনিষ্ঠার প্রমাণ রেখে গেলেন এই চরিত্রচিত্রণ সাবদারের কবিতার ওপর আরোপ করে। অন্তত দু জায়গায় মান্নান– এক জায়গায় ভুল উদ্ধৃতিসহ– সাবদারের চপেটাঘাত সাবদারের গালেই বসিয়ে দেন। (আবদুল মান্নান ১৯৯৭ : ৯, ১৬ ১৬ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতিটি বিকৃত বা ভুল)

মধ্যম শ্রেণির কবিরা কি করছেন এই ক্রান্তিকালে?

'যাত্রাপথ থেকে মুছে যাচ্ছে নদী
কেউ লিখছে না.....
মগজ দ্রুত কাগজ হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন'
(সাবদার ১৯৯৭, ৩৫)

'শুধু হাই তুলে তুড়ি মেরে
হামাগুড়ি কাটিয়ে দিচ্ছে কাল
লৌহসংস্কৃতির ক্রীতদাসেরা
শৃঙ্খলিত এরা মাংসে মজ্জায়
মুখোশজীবী এক নির্বাক সম্প্রদায়
রাষ্ট্রীয় পরিবহনে প্রত্যহ ফিরে যায়
নির্দ্ধারিত সিমেন্ট কৌটায়, মমি শয্যায়।'
(সাবদার ১৯৯৭ : ৩৭)

এই জাতের কবিরা যে ভাষায় লেখেন সে ভাষার নাম রেখেছেন সাবদার 'মোমবাতি ভাষা'। মোমবাতির আলোয় মেনিমুখো যে কবিতা লিখল :

'দিবালোকে সে কবিতা কটা লোকে
পাঠোদ্ধার পারে
মোমবাতি ভাষা কজন বুঝতে পারে...'
(সাবদার ১৯৯৭ : ৪৩)

এদের উদ্দেশ্যেই সাবদার বলেন : 'এখনো তুষার যুগে তোমরা এখনো সবাই।'

ফরাসি জাক লাঁকা মানুষের স্বার্থ-ইগো-অহংকে বলেছেন ব্যক্তির দর্পণ পর্যায়। শিশু বড় হওয়ার পথে– ছয় থেকে আঠারো মাস বয়সের মধ্যে 'আমি' বলতে শেখে। এই বয়সে আয়নায় নিজের পুরো শরীর একত্রে নড়তে-চড়তে দেখে নিজেকে চিনতে শেখা। মায়ের মধ্যে নিজেকে চেনাটাও একই চরিত্রের কাজ। এই পর্যায়ে শিশু মা'র কাছ থেকে আলাদা হয়নি। এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্যে বাবার আবির্ভাব শিশুকে জানিয়ে দেয় জগৎ ত্রিপাক্ষিক। মায়ের কাছ থেকে আলাদা হয়ে তাকে নতুন সম্পর্ক

মেনে নিতে হয়। এই মেনে নেয়ার পর্যায়টাই শিশুর মানুষ হওয়া, সমাজ, নীতি, আইন ও ধর্ম গ্রহণের কাল। দর্পণের পর্যায়ে শিশুর যে সংজ্ঞা তা আয়নার মতোই ভঙ্গুর, তা তখনও জগতের, নিঠুর ঈশ্বরের বিধানের ভেতর স্থাপিত নয়। সেটা শুধু মায়ের জগৎ, পিতৃ-অধিকারের পরাক্রম এখনও তার অজানা। এই পর্যায় থেকে পরের পর্যায়ে যাওয়ার পথটা ক্ষতচিহ্নময়– ট্রমাটিক। গ্রিক ট্রমা শব্দের অর্থও ক্ষতচিহ্ন। সাবদারের কথা আমরা আগেই তুলে দিয়েছি : 'স্বপ্নের সঙ্গে যুদ্ধে যুদ্ধে ক্ষতচিহ্ন বাঁচার?'

শিশু যখন নিশান জগতে বা বিধানের বিশ্বে প্রবেশ করে তখনও কিন্তু ছায়ার জগৎ বিরাজমান, শুধু তার ঠিকানাবদল ঘটে। যে জায়গায় গিয়ে সে আশ্রয় নেয় তার নামই অবচেতন। সে অবচেতন মগজের কোষে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় ব্যক্তির বাইরে, অন্যের লগে সম্পর্কের ভুবনে। কিছু কিছু লোক আছে যারা ছায়ার জগৎ থেকে কিছুতেই ছাড়া পান না। নিশানের জগতে উত্তরণ ছাড়া গতি নেই। মুক্তির পথ নিশানের ছোঁয়া এড়িয়ে নয়, তাকে জেনেই। বাংলা কবিতার নির্বাক সম্প্রদায় এখনও আয়না পর্যায়ে, মানে মানস পরিক্রমের আত্মপ্রতারক স্তরে। তাই সাবদার :

'এখনো দর্পণের দরজা ভেঙে বেরিয়ে
এলো না স্থিরচিত্র টুকরো টুকরো ভাঙল না
মানুষের ভগ্নাংশ দিয়ে কেউ
বানিয়ে দিল না পাখি।' (সাবদার ১৯৯৭ : ৪৩)

পাঁচ.
গেরিলা ও সন্ন্যাসী

'আলো জ্বালতে এসে ভুলে
আগুন ফেলেছি জ্বেলে'
(সাবদার ১৯৯৭ : ৫২)

নির্বাক এক মুখোশজীবী সম্প্রদায়ের দেশকে সাবদার– একই সাথে দৃষ্টিহীন জগতের রূপকে– বলেছেন 'বিনোদিনী চক্ষু হাসপাতাল'। তাই তাঁর যাত্রা নিরুদ্দেশ, 'অন্য অজ্ঞাতবাসে':

'বিনোদিনী চক্ষু হাসপাতাল ছেড়ে অন্য কোন
মানসনিবাসে চলে যাব আর নয়
রেটিনায় রক্তক্ষরণ...'
(সাবদার ১৯৯৭ : ৪৩)

এ জগৎ সাবদারের খুব প্রিয় কিছু নয় :

'এই অমানবিক পারমানবিক সভ্যতা শুধু জানে
জন্ম ট্রাফিক আর শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ'
(সাবদার ১৯৯৭ : ২৭)

সাবদার জানেন সাম্রাজ্যবাদ এক অদৃশ্য মাধ্যম :

ট্রাফিক দ্বীপপুঞ্জ থেকে

সমস্ত শহরকে শাসায়
ইশারায় থামায়, থামিয়ে দেয়
অতিকায় কচ্ছপের মতো ট্যাংক
সমস্ত নাগরিক যানবাহন
চন্দ্রতরী, সর্বশেষ নৌবহর
জাতিপুঞ্জের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
অতিকায় কালোগাড়ী আর
রেডক্রসের ধূসর গোঁয়ার ট্রাক।' (সাবদার ১৯৯৭ : ২১)

জার্মান ভাষার ভিৎস (witz) শব্দটিকে একসময় ইংরেজিতে তর্জমা হত উইট (wit) বা ফরাসিতে এস্প্রি (esprit) দিয়ে। আজকাল ইংরেজিতে এর তর্জমা, যেমন ফ্রয়েডের রচনাবলির অনুমোদিত অনুবাদে জোক (Joke) দিয়ে। এই দু ক্ষেত্রেই যুক্তি বা বিজ্ঞানকাহিনীর সাথে এর একটু ভেদ আছে (ন্যাগেলে ১৯৮৭ : ২৮)। সংস্কৃত 'বেদ' এই কথারই পূর্বপুরুষ–মনে রাখলে এই অর্থের পথ কতটুকু দীর্ঘ বোঝার ক্ষেত্রে সহজ হয়। উইটের মধ্যে কিছু জোক, কিছু প্রজ্ঞা আছে। কিন্তু ফ্রয়েডের মতে ঠাট্টার আসল ভূমিকা নিষিদ্ধ বস্তুর বস্ত্রহরণ এবং যুগপৎ আচ্ছাদন। ঠাট্টা 'এক বদমাশ যার জিব দুমুখো এবং যে একই সাথে দুই মনিবের দাস।' (ফ্রয়েড ১৯৬০ : ১৫৫)

সাবদারের উইট, বুদ্ধিদীপ্ত ভাঁড়ামো, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে নিপুণ। তাঁর 'একজন পুলিশ একটি রাষ্ট্র', 'কাক ও সাম্রাজ্যবাদ মূলত জ্ঞাতিভাই' বা 'জাতিসংঘের বদলে একটি কম্পিউটার যথেষ্ট' ইত্যাকার শব্দ-বাক্য এর উদাহরণ। সাবদার যখন লেখেন :

'একজন গেরিলা ও সন্ন্যাসীর
মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নেই
যেহেতু উভয়েই
মূলত ভ্রাম্যমাণ।'
(সাবদার ১৯৯৭ : ২০)

তখন শুধু চে'গুয়েভারার গেরিলাযুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কেই জানি না, সাবদারের বিবৃতিও পেয়ে যাই। পাখি সাবদারের কাছে একদিকে পূর্ণ মানুষের প্রতীক, মানুষের ভগ্নাংশ দিয়ে তৈরি। অন্যদিকে পাখি, গেরিলা ও সন্ন্যাসীরা জ্ঞাতি। এই নির্বাক মুখোশজীবীর দলে ক্লান্ত সাবদার 'পতাকাসর্বস্ব ব্যবহারিক ফলিত রাজনীতি' করবেন না। আবদুল মান্নান সৈয়দ একাধিকবার ইঙ্গিত করেছেন সাবদার কোনো রাজনৈতিক দলের ধামা ধরেননি। সভ্য হননি কবিসংঘের। এবং সংগত কারণেই তিনি চান পাখিদের দল করতে :

'তার চেয়ে চলে যাও পাখিদের প্রসূতিসদনে ডিমের উষ্ণ
খড় মৃত্তিকায় শিক্ষা নিতে পার নাও
কিভাবে করবে লংঘন
সমুদ্র আকাশ কিংবা তোমার সাহস সীমা

লাথি মেরে পাহাড়ে যায় কিভাবে পাখিরা জানে রাজনীতি'
(সাবদার ১৯৯৭ : ৬৩)

তাঁর স্বপ্ন এরকম :

'দেখবি তুই একদিন, সে দিন
কয়েকটা লাল-নীল-হলুদ উজ্জ্বল উচ্ছ্বল শার্ট
হৈ হৈ হুররে হল্লায়
এঁকে দেবে রাজপথে কোলাজ ব্লাডগ্রুপ
জেব্রা ক্রসিং, উজ্জ্বল বোতল বন্দী উচ্ছল তরুণ'
(সাবদার ১৯৯৭ : ৪৭)

তাঁর স্বপ্ন বিস্ফোরণের :

টাটকা সবজীর বদলে হেঁটে হেঁটে
গ্রাম থেকে আসবে দুর্ভিক্ষ, গোলাপ বাগান জুড়ে
ক্রমশ সমস্ত কুমারী বেণী আঁকাবাঁকা
ট্রেঞ্চ উঠবে গড়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বদলে
বাজবে দশদিকে বিস্ফোরিত সাইরেন।'
(সাবদার ১৯৯৭ : ৪৭)

এই তাঁর কর্মসূচি :

'ঘুম ভাঙিয়ে দেব সমস্ত ঘুমন্ত অগ্নিগিরির পোড়াব
পুড়বে স্বপ্নের নীলাভ ছায়াছবি দ্যুতি
জলবিদ্যুৎ প্রকল্প পুষ্ট নিয়ন্ত্রণ
শীতাতপ-জন্ম-যান ও মূল্যমান, শহর উপশহর...
(সাবদার ১৯৯৭ : ৪৭-৪৮)

'পোড়াব পাণ্ডুলিপি
কুয়াশাতুষার রাতে পুড়বে কবিতারা একদিন
এইবার আমার তুই দেখি নিস
এইসব ফুলের দোকান।'
(সাবদার : ১৯৯৭ : ৪৭)

কবিতার ওপর সাবদার শেষপর্যন্ত বিশ্বাস হারাননি।

'জীবনের ঝকঝকে আগুন থেকে ঝলসে বেরিয়ে আসে
কবিতা ইতিহাস'

কিংবা :

'রুটি মাটি থেকে জন্ম নেয় কবিতা ইতিহাস...'
(সাবদার ১৯৯৭ : ৬০)

আবদুল মান্নান সৈয়দ বর্ণিত ব্যক্তিগতের মধ্যে নিম্ন-মধ্যম শ্রেণির আর্তচিৎকার থাকা স্বাভাবিক ছিল। তার দেখা মেলে না।

সাবদার এক অমর আশাবাদী :

'পাতার তাঁবুর নিচে সবুজ যেখানে
ইস্পাত কোথাও না কোথাও মাটি।' (সাবদার ১৯৯৭ : ৪৪)
'ডাক দিয়ে যায়
আয় ওরে আয় আয়
আয় নারী
আয় বিপ্লবের ব্রহ্মচারী।' (সাবদার ১৯৯৭ : ৩৪)

সাবদার সিদ্দিকী কী রকম কবি ছিলেন– এ প্রশ্ন সংগতভাবেই তোলা যায়। বর্তমান দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদকে সাবদার জানেন 'অমানবিক পারমানবিক সভ্যতা' জ্ঞানে। কিন্তু ধনতন্ত্রের বৈমাত্রেয় কুলের কী অবস্থা?

'ক্রুদ্ধ ভাইরাস ছড়ায় হাওয়ায় আবহাওয়ায়
এশিয়ায় আফ্রিকায়
ওড়ায় ক্রুদ্ধ পতাকা তার ক্রুদ্ধ ভাইরাস
সাইপ্রাস থেকে এঙ্গোলায়
বন্দুক নির্গত ক্রুদ্ধ ভাইরাস
যুদ্ধ আর রেডক্রসের পতাকা ওড়ায়।' (সাবদার ১৯৯৭ : ২২)

এই বন্দুকনির্গত ভাইরাসের মুখোমুখি কী করবে, কমরেড?

দেশলাই ছাড়া কোন বাক-ব্যক্তি সম্পত্তি নেই
তুলে নিই চাই
কলম কিংবা কারবাইন
রুটির বদলে বারুদ কিংবা কৃষ্ণ ঘর্মাক্ত কলম বল্লম।'
(সাবদার ১৯৯৭ : ৫২)

কমরেড হাঁটেন। 'মাইল স্টোন হাঁটতে থাকল একপা দুপা।'
(সাবদার ১৯৯৭ : ৫৩)

অন্যদিকে :

'ম্যাচ বক্সহীন শহরের ক্রুদ্ধ যুবক
দড়ির আগুনে জ্বেলে নেয় সর্বশেষ সিগ্রেট তার।
দোতালা বাস থেকে ছাই ঝাড়ে
ছুঁড়ে মারে দগ্ধ সিগ্রেট
বিদগ্ধ শহরের বুকে।
গ্রামের সরল কৃষাণ তখন শস্যের
সবুজ জায়নামাজে নত
অবনত শস্যের সবুজে মিশে
গেরিলার মতো।'
(সাবদার ১৯৯৭ : ২৩)

এ আগুন ছড়িয়ে যায়নি। এ ছাড়া এরকম আবহাওয়ায় দেশলাই না-ও জ্বলতে পারে।

'একদা তুমি বলেছিলে
লাল সূর্যটাকে পিটিয়ে পিটিয়ে হাতুড়ি
কাস্তে বানাবে, লোহা পিটিয়ে সোনা
গাধা পিটিয়ে ঘোড়া।

তোমার কথা ছিল
এক রাখাল করাল কালের বাঁশি
বাজাতে বাজাতে হেঁটে যাবে সোনালক্ষ্মী ধান কাঁথায়, কোথায়

(সাবদার ১৯৯৭ : ৫৫)

গোলাম সাবদার সিদ্দিকী কেন তাঁর নামের 'গোলাম' অংশটি কেটে সাবদার সিদ্দিকী হলেন আমি তার মর্মোদ্ধার করতে পারলাম না।

'অথচ কোমরে ছিলো তাঁর
নদীর মত বাঁকা উজ্জ্বল এক তীক্ষ্ণ তলোয়ার।'

সিদ্দিকীর কবিতায় রাজনীতি আছে এবং সে রাজনীতি কিছুটা বিপ্লবমুখী এটুকু আশা করি সন্দেহ করা যায়। সাবদার সিদ্দিকীর কবিতায় রাজনীতি বিষয়ে অধিক লিখিলে আবদুল মান্নান সৈয়দের অনর্থক গৌরব হয়।

উৎস: 'আমি তুমি সে গ্রন্থ'।

[লেখক: প্রাবন্ধিক। প্রথিতযশা বক্তা। অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ।]

সাবদার সিদ্দিকী, প্রিয় কবিতা: একটি দায়বদ্ধ ভূমিকা

ম ন জু রু ল আ জি ম প লা শ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই সাবদার সিদ্দিকীকে চিনতাম। তাঁর সাথে মিশবার সুযোগও হয়েছে কয়েক দফা। শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে যতটুকু আগ্রহ ছিল, যতটুকু বিচরণ ছিল– সেই সূত্রে সাবদার সিদ্দিকী খুব টানত। তাঁর জীবনযাপন, পোশাক, কাব্য-কবিতা সবকিছুই অপ্রচলিত ছিল। কিন্তু সাবদার-এর কাছে সাবদার অপ্রচলিত ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর কাছে তাঁর জীবন, পোশাক, কাব্য-কবিতা সবই ছিল সাময়িক। তিনি হঠাৎ অদৃশ্য হতেন, আবার তাঁর মতো করে দৃশ্যমান হতেন। এভাবে সাবদার সিদ্দিকীর সাথে মাঝে মাঝে দেখা হত। তারপর অনেকদিন দেখা নেই। হঠাৎ জানলাম, তিনি আর নেই। কষ্ট পেয়েছিলাম। সাবদার সিদ্দিকী যখন ছিলেন, যখন চলে গেলেন এই দুটি বিষয়ের খুব বড় পার্থক্য করা যায়নি। তাঁর অস্তিত্ব অর্থবোধক ছিল খুবই সীমাবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মাঝে, কিন্তু যাঁদের সঙ্গেই তাঁর অস্তিত্ব অর্থবোধক ছিল তাঁরা সবাই সীমাহীন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, আছেন। এ কারণে সাবদার সিদ্দিকীর মৃত্যু এই সীমাবদ্ধ সীমাহীন ব্যক্তিত্বদের কষ্ট দিলেও অন্য সব জায়গায় তিনি পূর্বের মতোই উপেক্ষিত থাকেন। আমরা মানচিত্র (জাপান) পত্রিকায় জুলাই '৯৫ সংখ্যায় সাবদার সিদ্দিকী সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলাম, তখন মনে আছে, নিজের কষ্ট কিছুটা হালকাবোধ করেছিলাম। তারপর আবার অনেকদিন চলে গেল এরই মধ্যে একদিন আমার খুব ঘনিষ্ঠ সুহৃদ কামাল পাশা চৌধুরী সাবদার সিদ্দিকীর 'প্রিয় কবিতা' আমার হাতে তুলে দিলেন। আমি পরম যত্নে তা রেখে দিলাম। একটা নীরব অপেক্ষা ছিল, কখনো যদি 'প্রিয় কবিতা' কাজে আসে। ইতোমধ্যে ঘাস ফুল নদী থেকে সাবদার সিদ্দিকীর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। এদিকে জানলাম, নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত শামস আল মমীন সম্পাদিত 'আকার ইকার' সাবদার সিদ্দিকীর কবিতার বই-এর দীর্ঘ রিভিউ করতে যাচ্ছে এবং যেহেতু প্রকাশিত বই-এ প্রিয় কবিতার প্রাসঙ্গিক স্থান তা বিবেচিত হল। কামাল পাশা চৌধুরী জানিয়েছেন যে, 'প্রিয় কবিতা' প্রেস পর্যন্তই ছিল, বিতরণ করা হয়নি এবং কবিতাগুলো সম্ভবত কোথাও প্রকাশিত হয়নি। এদিকে কুয়াত-ইল-ইসলাম (সহযোগী সম্পাদক–শৈলী) জানিয়েছেন যে একসময় সাবদার সিদ্দিকী তাঁকে এবং নির্মলেন্দু গুণকে 'প্রিয় কবিতা' দিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে 'প্রিয় কবিতা' ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হয়নি এবং প্রকাশিত হয়েও অনেকটা অপ্রকাশিত ছিল। প্রিয় কবিতার প্রকাশকাল আষাঢ় ১৩৯০। মুদ্রণে : চৌধুরী প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিকেশন্স। ২৪/৪ শান্তি নগর সুপার মার্কেট,

চামেলীবাগ, ঢাকা-১৭। প্রিয় কবিতা একটি ১৬ পৃষ্ঠার চটি বই হালকা বাদামি কাগজে কালো কালিতে ছাপা। প্রিয় কবিতার সূচনা পৃষ্ঠায় একটি ডিজাইন আছে যা সাবদার সিদ্দিকীর নিজের হাতেই করা। কবিতাগুলো বরাবরের মতোই 'সাবদার সিদ্দিকীর কবিতা।' পাঠকদের জন্য কবিতাগুলো প্রকাশ করা হল। চটি বই-এ কয়েকটি বিজ্ঞাপন আছে যা বাদ দেয়া হয়েছে। চটি বইটি আমার সংরক্ষণ থেকে 'আকার ইকার'-এ প্রকাশিত হবার জন্য যতটুকু ভূমিকার প্রয়োজন ছিল ততটুকু বলতে চেষ্টা করেছি। যেহেতু চটিটি আমার কাছে ছিল তাই এই বলাটা কিছুটা দায়বদ্ধতার পর্যায়েও পড়ে। পাঠকদের কাছে কবিতাগুলো ভালো লাগলে আমার এই সংরক্ষণ সার্থক হবে। দায়বদ্ধতা থেকেও নিজেকে স্বাধীন মনে করব।

সাবদার সিদ্দিকীর অগ্রন্থিত কবিতা

প্রিয় কবিতা

আগুন জ্বালাও
জ্বালাও
দেখও যেন ধোঁয়া না হয়।
আগুন জ্বালা ও
দেখি ধোঁয়া নয়।
দেখও
যেনও ধোঁয়া না হয়।

কবিওয়ালা

গড়মানুষের ভিড়ে নিজেকে দিই ছুড়ে গণমানুষের ছড়াই
গড়পড়তা হাত পা মাথার সাদা কালো নানান রঙিন ভিড়ে
উচ্চতা ছ'মিটার প্রায়
ওজন আনুমানিক ৫০ কিলোগ্রাম
কপালে কাটাচিহ্ন ছাতি বত্রিশ
পৃথিবীর সাথে প্রায় ৩২ বছর কয়েকমাস কয়েকদিন
যুদ্ধ মাত্র পথে পথ
এই পরিচয় পরিণয়
চোখের রং কালও চুল তাও কালও
বাংলায় কথা বলি চলি
পরনে ফুলপ্যান্ট পাঞ্জাবী চশমা কালও
স্যান্ডেল টায়ারের কালও
দুহাতে মুক্ত হস্তে ওড়াই কাগজের পাখি নৌকা ইত্যাদি
অথচ আমি আজ হারিয়ে গেছি

পথজুড়ে সাদাকালো মাথার মাথাপিছু মানুষের
গড়পড়তা ভিড়ে।
সন্ধানপ্রার্থী সাবদার সিদ্দিকি প্রায় হারাই
আজও আমি হারিয়ে গেছি.......
আজ সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত আবহাওয়ার খবরে বলা হয়েছে যে সারা
দেশের আবহাওয়া প্রধানতঃ শুষ্ক থাকবে। দিনের তাপমাত্রা সামান্য
বৃদ্ধি পাবে। গতকাল সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে
২৩ দশমিক ছয় ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং ২৩ দশমিক ইত্যাদি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।
বাতাসের আর্দ্রতা সকাল নটায় শতকরা ৭৯ ভাগ সন্ধা ছটায় বাহাত্তর ভাগ।
আজ সূর্যাস্ত ৫টা ৪১ মিনিটে আগামীকাল সূর্যোদয় পাঁচটা
একান্ন মিনিটে এমতাবস্থায়.... ....
গলি থেকে গলি নানা কানাগলি উপগলি পেরিয়ে পথে বন
রাজপথে চলি কবিওয়ালা চোখে চোখে আর মনে মনে বলি
নিম্নলিখিত কথাগুলি
আপনার মনে আপনে গান করে চলি গোপনে
শিশু ও পশুর যুদ্ধ চাই
যে যুদ্ধের শেষ নাই
সেই যে যুদ্ধে চলে যায়
সেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ আজ লড়াই
মানবযান চল যাই হারাই ছড়াই
সামনে ভিড় বাড়ীর
গাড়ীর সচল পার্শ্বদৃশ্য বাড়ী গাড়ী শাড়ি ভুঁড়ি চুড়ি কড়ি ভেড়ী
কবিওয়ালা
ঘাতক খাতক
সাঁই কসাই দেখি সবাই আর
ডাক্তার উকিল মোক্তার প্যাসেঞ্জার জোতদার পেশকার চৌকিদার
ঠিকাদার বেকার দোকানী চোরাচালানী জ্ঞানী ধনী ঋণী খুনী
খঞ্জও আসক্ত তিক্ত রিক্ত বিরক্ত ভক্ত মোটা বেঁটে কালো
সাদা শক্ত নোংরা শ্যামলা মাঝারী হাল্কা পাতলা মাঝারী
কামার কুমার পুতার ছুতার চামার বেশ্যা বাউল দালাল
মাতাল লাল আমদানী রপ্তানীকারক অধ্যাপক সম্পাদক
চিত্রগ্রাহক প্রতিবেদক প্রতারক পর্যটক বাস ট্রাক ট্যাক্সি টেম্পো
চালক পৌরজন মানুষ। মানুষ। আর
মেয়ে মানুষ! ছেলে মানুষ
কালও মানুষ! ভালও মানুষ!
লম্বা মানুষ! বেঁটে মানুষ!

বনের মানুষ! মনের মানুষ!
বাঁকা মানুষ! সিধে মানুষ!
বোকা মানুষ! একা মানুষ!
একমাত্র সংবাদপত্রই যেন ধর্মগ্রন্থ আধুনিক ছাড়া আর কোনও
বন্ধু নাই সবাই প্রবাসে প্রায় আর যারা ইতিমধ্যে প্রায় বাসা
বদল করে চলে গেছে সব ভিন্ন ভিন্ন ভাড়াটে বাসায় ভুলে
গেছি বাড়ী গাড়ী বন্ধুদের চুল চোখ নখ ও স্ত্রীর রং
এই সে শহর ক্রমবদ্ধমান যে আমার লক্ষ লক্ষ
গ্রামকে গ্রাম করেছে গুম খুন
পাটক্ষেতে অবৈধ ভাসমান ভ্রুণ নিরাপদ দূরত্বে থাকুন
আগুনের সাথে সহযোগিতা করুন
আমি জ্বলব আগুন পরমাণু পুরান রুটি ও বোমার রাষ্ট্রায়ত্ত
দোকান বিভ্রান্ত বিজ্ঞান নভোযান...
ওষধি বনে জ্বেলেছে সে মাংস পোড়া আগুন এইতো সংবাদ
দেখুন এতে শুধু এই এলাকার নয় গোটা দেশের নারী হত্যা ও
নির্যাতনের খণ্ডচিত্র পাওয়া যেতে পারে কেবলমাত্র দিনাজপুরে
৮২র জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কেবলমাত্র দিনাজপুর
জেলাতেই গৃহবধূ খুন ও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে ২৩টি।
এরমধ্যে আত্মহত্যা ৮টি পার্বতীপুরের ৬৫ বছর বয়স্কা এক
বৃদ্ধা আত্মহত্যা করেছে গলায় দড়ি দিয়ে অন্যেরা বিষ পানে
পারিবারিক কলহ এইসব আত্মহত্যার মূল কারণ। শুধু একজন
যুবতী আত্মহত্যা করেছে প্রেমঘটিত কারণে। অন্যত্র দিনাজ
পুর বাদে উত্তরাঞ্চলের অন্যত্র উল্লেখিত সময়ে ৩৯ জন গৃহবধূ
খুন হয়েছে কিংবা আত্মহত্যা করেছে এইসব ঘটনার কারণ হলও
১। স্বামীর অত্যাচার (২) পিতার বাড়ী থেকে টাকা আনতে
না পারার কারণে মারপিট (৩) সতীনের সাথে কলহ বিবাদ
(৪) সম্পত্তি নিয়ে গোলমাল (৫) অবৈধভাবে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে
যাওয়া ইত্যাদি পঞ্চগড়ের যুবতী চাকরানী জরিকা খাতুন খুন
হয়েছে সে অন্তঃসত্তা। শিবগঞ্জের ফানুসী বেগমকে তার আপন
ভাই গলা কেটে হত্যা করেছে। একই এলাকার যুবতী রাজিয়া
বেগমকে হত্যা করা হয়েছে কারণ অজ্ঞাত। ঠাকুরগাঁয় ভাতার
মারীতে ডাঙ্গি ছুরি দিয়ে গলাকাটা অবস্থায় দুটি লাশ উদ্ধার
করা হয় এমতাবস্থায় একমাত্র শিশুরাই প্রকৃত প্রস্তাবে একান্ত
বন্ধুরা আমার।
এরাই বীজ ছায়া চারা কলম কীটনাশক সেচ ও সার রবিকরোজ্জ্বল
ঢেউ ঢেউ খামার

শিক্ষা পুষ্টি ও দৃষ্টিহীন শিশুদের হাতে হাতে পৌঁছে
দিতে চাই স্বাস্থ্য ও তার স্তনের অধিকার ভেষজের ছায়া
দেশজ জীবন ভীষণ
এই যে স্বাধীনতা
ঐ পাতার পতাকা
কবিতা অপূর্ব বারতা
চল যাই
চাঁদে যাই
রাজনৈতিক আশ্রয়ের মনস্কামনা জানাই
নইলে চাঁদের সাথে চলবে তুমুল লড়াই
আজীবন মুক্তিযুদ্ধ রত আমি ক্ষতক্লান্ত এক রক্তের সমুদ্রে
সাহসী নাবিক এক সশস্ত্র দৈনিক ধারিনা কিছুর ধার
পদক স্মারক প্রমাণপত্র উপহার ভাতার কিংবা শহীদ মিনার
মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ সংসদ সদস্য আজীবন
মাটির মুকুট এ আমার মাটির সিংহাসন
কল্যাণ প্রশাসন ঐ
চাই ঐ চাঁদের সিংহাসন।

চলবে

ভালবাসা হারায় ওরা
কুড়ায় আবার
ছড়ায়।
ভালবাসা হারায় প্রায়
কথায় কথায়
ছড়ায় ওড়ায়।
আবার ভালও বাসায় হারায় প্রায়।

উৎস: শামস আল মমীন সম্পাদিত 'আকার ইকার' কবিতার কাগজ। সংগ্রহ সহযোগিতায়: মুনির মোরশেদ, স্বত্বাধিকারী, ঘাসফুলনদী প্রকাশনী।

[লেখক: প্রাবন্ধিক।]

ভাঙা লিরিকের, ভাঙা বয়ান ১: কবি সাবদার সিদ্দিকী

চ য় ন খা য় রু ল হা বি ব

বোহেমিয়ান রাপসোডিঃ

নৈরাজ্যের স্ফুলিঙ্গ ছাড়া বিবর্তনের পরিসর ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ১৯৭২ থেকে ৯০ দশকের শুরু অব্দি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এলাকা থেকে পুরান ঢাকার বুলবুল ললিতকলা একাডেমির আশেপাশের হাঁটাপথে দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছিল তোষকের মোটা কাপড়ের আলখাল্লা গায়ে, তারের ফ্রেমের গোল চশমা চোখে, কখনো খালি পায়ে কখনো বা খড়ম পরা, হালকা ফুদ্দি দাড়ি, মোচ, ঘাড়ছোঁয়া বাবরি চুলের, ভাঙা চোয়ালের ছোট্ট একহারা গড়নের সাবদার সিদ্দিকী!

শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী, আহসান হাবীব, সাইয়িদ আতিকুল্লাহ, সৈয়দ হকদের নাগরিক প্রবর্তনার কবিতা; আল মাহমুদ, ওমর আলি, দিলওয়ারদের লোকসংস্কৃতি-ঘেঁষা উচাটনের পর পর আবুল হাসানের আত্মবিলোপী দোলাচলে যোগ হতে পারে সাবদারের নৈরাজ্যিক বিবৃতি! সমকালীন সমীকরণে যা নৈরাজ্য তাই আবার হয়ে ওঠে ভবিষ্যৎবোধক মূলধারার ধ্রুপদ পত্তনি; অবশ্য মূলধারা যদি সেই নৈরাজ্যের ধক ধারণের মতো সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় আভিজাত্যবোধ এবং গোত্রানুগত্যের সেন্সরশিপ এড়িয়ে।

এবড়োখেবড়ো সমীকরণঃ

সাবদারের সময় ও ব্যক্তিত্ব বুঝতে অনেকগুলো সমীকরণের ক্রমানুবর্তিতা দরকারি হয়ে পড়েঃ

১) হাঁটু অব্দি চামড়ার বুট, জিনসের শার্ট গোঁজা সত্তর দশকের তরুণী ভাস্কর শামিম শিকদার, কবিতার সাবদার য্যানো ফররুখ আহমেদ, সৈয়দ আলি আহসানদের বিরোধার্থক এন্টি থিসিস! আবার শামীম যেখানে চারুকলার শিক্ষক, সাবদার সেখানে ছাত্র, শিক্ষকের আনুষ্ঠানিকতার বাইরে তৃতীয় মাত্রিক অস্তিত্ব-জ্ঞাপক!

২) প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক "সমাজে র‍্যাডিকাল পরিবর্তনের পর ক্রমশ বেড়ে যাওয়া আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে যে সঙ্কট, (যেরকমটা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর)"... প্রবর্তনার কথা বলে যেখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরদের দৃষ্টান্ত-পুরুষ হিসেবে তুলে ধরছেন; আহমেদ শরিফ বাংলা ভাষা, বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয়ের কথা বলতে যেখানে অপরাপর আদিবাসী-নৃগোষ্ঠীর প্রতীকগুলোর বর্ণনা করছেন; তখন তত্ত্বীয় "ক্রমশ বেড়ে যাওয়া আশা-আকাঙ্ক্ষা" এবং নৃতাত্ত্বিক-বিবর্তনের গোল্লাছুট–

এম্পাওয়ারমেন্ট হিসেবে আমরা পাই সাবদার সিদ্দিকীদের! প্রতীকের পরোক্ষতা, বিমূর্ততার সীমানা ভেঙে পড়ছে ভাঙা লিরিকের, ভাঙা বয়ানের প্রত্যক্ষ পরিক্রমায়।

৩) প্রাগ্রসর ঈশ্বরচন্দ্রদের স্বস্তিপতন যেখানে ঘটছে মধুসূদনের শ্রেণিচ্যুত, ধর্মান্তরিত মতিচ্ছন্নতায়; সেখান থেকেও সাবদার তার পথক্রম সংগ্রহ করে নিচ্ছে: খেয়াল করুন যে মাইকেলের বাবা'র জন্ম যশোরে এবং জীবিকাসূত্রে স্থায়ীবাস কোলকাতায়। সাবদারের জন্ম আইনব্যবসায়ী মুসলমান বাবার ঘরে কোলকাতায়; রায়টসূত্রে ষাটের দশকে পরিবারের সাথে অষ্টম শ্রেণিতে পড়বার সময় বাংলাদেশের সাতক্ষীরায় আগমন; সংখ্যালঘুর অস্তিত্বজাত হুমকির মুখোমুখি হয়েও স্বাধীন বাংলাদেশে সংখ্যাগুরুদের কথিত তত্ত্বীয় জাত্যাভিমানে আক্রান্ত না হওয়া! ১৯৪৭-এর পর পশ্চিমবঙ্গ থেকে পরিবারের সাথে কিশোর বয়সে বাংলাদেশে আসা শহিদ কাদরী, মাহমুদুল হক, মান্নান সৈয়দেরও সামাজিক পটভূমি একই ধরনের। সাবদারের চলনে, বলনে যা ব্যক্তিক তাই রাজনীতিক: এই 'ব্যক্তিক' জায়গাটায় অপরাপর অধিকার সংরক্ষিত না হওয়াতেই সাবদারদের নান্দনিক-খেলাঘর বিপন্ন!

সাবদার নেরুদাকে নিয়ে লিখছে, তাতে বিপ্লব ও স্বপ্নের প্রতি তার মুগ্ধতা প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু বাস্তব ও মনোবিপ্লবের পর যে থিতু, স্বপ্নের পর যে জাগানিয়া-আড়মোড়া তা ওর চরিত্রে পাওয়া যাচ্ছে না। চিত্র তৈরি হচ্ছে একের পর এক মানসিক বয়ানে, সঙ্গলিপ্সু হাঁটাবাবা আড্ডায়, ছড়ানো-ছিটানো কবিতায়; এপিকের সম্ভাবনা বিলীন হয়ে যাচ্ছে ফ্রেমবিহীন সময়ের তেলরঙে, জলরঙে! শৈশবের শরণার্থী, কৈশোরের মুক্তিযোদ্ধা, তারুণ্যের ভবঘুরে সাবদার সামাজিক কোনো সজ্ঞ বা পেশায় না গিয়েও সময়ের শিকারও বটে! আত্মীকৃত নন্দন একটা বর্ম; সেই বর্ম যাতে চর্চাকারীর দেহে চেপে বসতে না পারে তার ব্যবস্থা হিসেবে সাবদারের কিয়েরকেগার্দ পাঠ: একশন এবং দর্শনের একরৈখিকতায় সমর্পণের ইচ্ছা। কিন্তু যাপনের পাঠ তো আর একরৈখিকতার ক্লান্তি নয়! ছুটে ছুটে বেরিয়ে যাওয়া মায়াকোভস্কিয়ান-মউত-কি-গোলা!

মধ্যবিত্ত আয়াস, উচ্চাকাঙ্ক্ষা পার হয়ে সাবদারের যে পাঙ্খা-জীবন তাতে চঞ্চলতা এবং অবসাদগ্রস্ততার বিরামচিহ্ন একাকার! '৫০-এর যে কোলকাতায় তার জন্ম; সেখানের হাওড়া ব্রিজকে তার মনে হয়েছিল ''লোহার ব্রেসিয়ার'', পুরো কোলকাতাকে মনে হয়েছিল, ''সন্ন্যাসীর লিঙ্গের মতো নিস্পৃহ''। ১৯৭১-উত্তর যে ঢাকাকে সাবদার তার দ্বিতীয় জন্ম-জাতিস্মর-শহর হিসেবে নিয়েছিল তার করাল যানজট, ভিড়েভিড়াক্কার, নৈর্ব্যক্তিক, নিষ্ঠুর বৈষম্য কি সাবদার নিষ্ক্রান্ত হবার পরও লাখো সন্ন্যাসীর উদাসীনতাকেই ধারণ করে না?

সন্ন্যাসব্রত ভণ্ড বা পেশাজাত কি না তা ধরিয়ে দিতেই যেন সাবদারদের আবির্ভাব এবং নিষ্ক্রমণ! কেউ কেউ দেখাচ্ছে বোহেমিয়ানের-লালন-ধ্বজা, আবার পকেটে রাখা মোবাইল ফোনে, নোটপ্যাডে হিসাবের খাতা ঠিকঠাক, তাদের সাথে তো মিলেই না সাবদারের; অন্যদের সাথে তো মাইলের পর মাইল গরমিল!

প্রথম 'সাবদার সংগ্রহ':

২০১০-এ যখন আমি বেশ কয়েক মাসের জন্য বাংলাদেশ-এ অবস্থান করি তখন নিজ উৎসাহেই দেখা করি বুলবুল ললিত-কলার আড্ডাতে সাবদারের এবং ভাস্কর রাশা'র ঘনিষ্ঠ সঙ্গ পাওয়া 'ম্যাগনাম ওপাস' প্রকাশনীর কর্ণধার আনোয়ার ফরিদির সাথে। এর আগেই আমার হাতে এসেছে মুনীর মোরশেদ, মাহবুব কামরান, সমুদ্র গুপ্তের সহায়তায় আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, 'সাবদার সিদ্দিকী কবিতাসংগ্রহ'! একই সংগ্রহে নামের বিভিন্ন বানান, শব্দবন্ধনীর কিছু মুদ্রণপ্রমাদ থাকলেও; সাবদারের জীবিতকালে কোনো সংগ্রহ না প্রকাশ হওয়াতে এ-সংগ্রহটার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সম্পাদকের প্রয়াণের ফলে এই সংগ্রহটার নবায়িত, পরিমার্জিত সংস্করণের আর অবকাশ নেই। ভ্রান্তি অন্বেষণ নয় বরং একটা সময়ের তুলনামূলক আলোচনাকে গড়িয়ে সম্পূরক একটা পটভূমির আয়োজন এবং আশি থেকে পরের তিরিশ বছরের কবিতাভূমার নিশানা নিরিখই এ-রচনার লক্ষ্য।

সাবদারের সহজাত নৈরাজ্যের সাথে মান্নানের অর্থোডক্স সাংস্কৃতিক মনোভঙ্গির দূরত্ব লক্ষণীয়। মান্নানের সামাজিক, পারিবারিক, সাহিত্যিক, আর্থিক, ধার্মিক, সবকিছুই হিসাবি, গোছালো, আবাসিক। সাবদারদের সবকিছুই অনাবাসিক, সৃষ্টিছাড়া; কিন্তু বেহিসাবি, আগোছালো কি? আমার তা মনে হয়নি। ন্যূনতম সরঞ্জাম, তা পরনের ফতুয়া হোক, থলিতে রাখা পানি, পানের ঘটি হোক, চুল আঁচড়ানোর চিরুনি হোক, পায়ের খড়ম হোক, কবিতার আঁকিবুঁকি ও কলম সবকিছুর প্রতি যত্নবান ছিলেন। এটা হিসাবের উপরের মহাহিসাব: যেন এই সমস্ত সরঞ্জামের সাথে তার একটা ব্যক্তিক দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার সম্পর্ক!

আশির দশকে আমার নিজস্ব উদ্ভ্রান্ত-নিউরোলজির সুবাদে, আর বাসার কাছাকাছি হওয়ায় নিয়মিত যেতাম ঢাকেশ্বরী মন্দিরের সামনেকার কবি আবিদ আজাদের 'শিল্পতরু' প্রেসে। 'কবি' পত্রিকা ঘিরে ওখানে যাতায়াতকারীদের ভেতর আরো ছিল আহমেদ মুজিব, রিফাত চৌধুরী, কাজল শাহনেওয়াজ, পুলক হাসান, শামসেত তাবরেজি, বুলান্দ জাভির, রাজু আলাউদ্দিন। এর মধ্যে আমার, রিফাতের, কাজলের আরো কিছু পারস্পরিক সার্কিট ছিল। আবিদ ভাই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ওখানে প্রায়ই আসা অগ্রজ মুস্তফা আনোয়ার, মান্নান সৈয়দের সাথে। কবিতা দিতে মাঝেসাঝে সাবদার ওদিকে আসলেও ওর সাথে আমার নিয়মিত দেখা হত টি.এস.সি. এলাকায়, '৮৫-৯০-তে প্রায় প্রতিদিন।

যদিও মুস্তফা আনোয়ার বাংলাদেশ বেতারের একজন কর্মকর্তা, পোশাকে সাহেবি, কেতায় চোস্ত; পিছনে ফিরে তাকালে 'তুত', 'ক্ষুর'-এর লেখক মুস্তফার মনস্তত্ত্বকে আমার সাবদারের রাস্তাফেরি জীবনের সম্পূরক মনে হয়। দুজনেই ছিল প্রাচীরের ঐ পারের বস্তি ও জেলখানার প্রতিনিধি, নিছক সফরকারী নয়! মুস্তফার সাথে জমাটি একটা উপদ্রবমূলক ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে তখন, আর সাবদারের সাথে অন্তরঙ্গতাটা ছিল অনুজের প্রাণিত উদ্দীপনার! এমন হয়েছে যে দুপুরের বিরতিতে মুস্তফা ভাই এসেছে আবিদের প্রেসে ড্রাইভার চালানো গাড়িতে, অল্প পরেই চলে যাবে, লিফট চাইলাম

টি.এস.সির; নামিয়ে দেবার আগে চান খাঁ-র পুলে উনি কিনলেন এন্তার ইনোক্টিন, দুজনেই মুখে পুরলাম বেশ কয়েকটা, টি.এস.সি-তে নেমে ঠোক্কর খেলাম সাবদার বা হ্যাপির সাথে। মুস্তফা, সাবদারের অবশ্য পারস্পরিক সখ্যতা ছিল না! এ-দুজনের সাথে যে হাওয়াই-মিঠাই-মিটমিটে রসস্থতা সে তুলনায় মান্নানের লেখালেখি, সঙ্গের প্রতি কোনো আকর্ষণই আমি কখনো বোধ করিনি।

নিজের যাত্রাপথের সাথে সাযুজ্য খোঁজার ইতিবাচক প্রবণতা থেকেই হয়তো মান্নান সাবদার সংগ্রহের ভূমিকাতে লিখেছেন, ''ক্যালিগ্রাফির দিকে সাবদার সিদ্দিকীর প্রবণতা তো স্পষ্টত আপোলিনায়ারের স্মারক''। এখানে না বলে পারি না যে স্যুরিয়ালিজমের জনক ফরাসি কবি শব্দ দিয়ে ছবি তৈরির যে খেলাতে মেতেছিলেন, তাকে অভিহিত করেছিলেন, 'ক্যালিগ্রামস'' বলে, 'ক্যালিগ্রাফি' নয়। আবার সাবদারের আপোলিনায়ারের 'ক্যালিগ্রামস' দেখা থাকলেও, ক্যালিগ্রাফির ইতিহাস আরো পেছনের। আরবের, পারস্যের, তুরস্কের মুদ্রকেরা ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও অনেক বইতেই আরবি, ফারসি, তুর্কি বর্ণমালাকে ছবির আদলে সাজিয়েছে, এসব বই মুসলিম পরিবারের কোলকাতার মান্নান সৈয়দের মতোই সাবদার নিশ্চয় অনেক আগে থেকেই দেখেছে। আবার আরবদের আগে থেকেই গির্জার অলঙ্করণে খ্রিস্টানেরা যে ক্যালিগ্রাফি করে আসছিল তা-ও মিশরীয়রা, ব্যাবিলনীয়রা পিরামিডের আগের আমল থেকেই করে আসছিল। এখানে অবশ্য সাবদারকে পশ্চিমের নান্দনিক নিরীক্ষা, বিশেষ করে আপোলিনেয়ারের সাথে তুলনা করবার জন্য মান্নানকে আমি ধন্যবাদ না জানিয়ে পারি না।

মান্নান সৈয়দের সাবদার- সম্পাদনা নিয়ে প্রবর্তনাগত কিছু প্রশ্নও তোলা যেতে পারে! ভূমিকাতে মান্নান দাবি করছেন, ''সাবদার কখনোই স্লোগানধর্মী বা ইজম-তাড়িত কবি ছিলেন না– বরং নিষ্ঠ ছিলেন কবিতার আঙ্গিকের প্রতি।'' (পৃঃ ১৫, সাবদার সিদ্দিকী কবিতাসংগ্রহ)। যারা মান্নানের জীবনানন্দকে নিয়ে লেখা 'শুদ্ধতম কবি' এবং অন্যান্য রচনার সাথে পরিচিত, তারা জানবেন যে কলাকৈবল্যবাদের প্রতি যেমন মান্নানের ঐকান্তিক আনুগত্য ছিল, সেরকম কেন্দ্রনিবিড় ধর্মবোধের প্রতি তার পক্ষপাত ছিল। এই পক্ষপাতই জীবনানন্দ পর্যবেক্ষণে রাজনৈতিক প্রাগ্রসরতা এবং অস্তিত্ববাদী ব্যক্তিক স্বাধীনতাকে গৌণ করে 'শুদ্ধতম...' অভিধার জন্ম দিয়েছে। 'স্লোগানধর্মী'' বা 'ইজমতাড়িত' না হয়েও যে একজন অঙ্গীকারাবদ্ধ বা কমিটেড থাকতে পারে, তা প্রথমজীবনে 'স্যুরিয়ালিজমে', মধ্য ও শেষ জীবনে 'পিউরিটানিজমে'' আক্রান্ত মান্নান অবশ্যই জ্ঞাত ছিলেন।

ষাটের সাইঝপাড়াতেঃ

একটা যোগসূত্র উল্লেখ না করলেই নয়। সময়সূচক মেলালে দেখা যাবে, 'দৈনিক গণবাংলাতে' যখন সাবদারের নেরুদা বিষয়ক গদ্য এবং আরো কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়, তখন (১৯৭২/৭৩) কবি আবুল হাসান সেখানে বার্তা বিভাগে সহ সম্পাদক হিসেবে কাজ করছিলেন। নির্মলেন্দু গুণের এক স্মৃতিমূলক রচনায়ও পদ্মা পারাপারের

এক অভিযানে সাবদারকে আবুল হাসান, নির্গুণের সহচর হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে। সাবদার যখন কবিতা দেয়া শুরু করেছে তার বছর তিনেকের ভেতরেই আবুল হাসান ১৯৭৫-এ ২৮ বছর বয়সে বাংলা ভাষার কবিতাসভায় কয়েকটা অজরামর সংগ্রহ রেখে চিরতরে প্রয়াত! ৭০-এর দশকেই নির্গুণের দ্রষ্টব্য সংগ্রহগুলো প্রকাশিত এবং তার পরেও অজস্র প্রকাশনা। এখানে সাবদারকে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুভব করতে দেখা যাচ্ছে না; ঘনিষ্ঠজনদের কাছে তেমনটা শোনাও যাচ্ছে না। জীবন নিয়ে সৃষ্টিছাড়া পরীক্ষা করতে গিয়ে কি পরীক্ষার রসায়নেই ভস্মীভূত হয়েছিলেন? মাছের সওয়ারিদের মতোই ফেরার নৌকা পুড়িয়ে ফেলে পারে নেমেছিলেন? যাত্রাতেই ছিলেন আনন্দিত লক্ষ্যভেদের চেয়েও? নির্দেশনাহীন এই আত্মনির্দেশনা কি নৈরাজ্যের চেয়েও প্রবল এক আত্মবিলোপী ব্ল্যাকহোল? এই প্রশ্নগুলোর সমাবেশ কোনো তত্ত্বের অবতারণার জন্য নয়; কোনো ধারাবাহিক যুক্তিবোধের আলোকে এই প্রশ্নগুলোকে সূত্রবদ্ধ করলে ''সৃষ্টিছাড়া' শব্দটারও আর কোনো অর্থ থাকে না! এই সৃষ্টিছাড়া, মতিচ্ছন্নতাইতো সৃজনশীলতার অমূল্য প্রণোদনা!

১৯৭৫-এর পর থেকে যেভাবে বাংলাদেশ নিজেকে সাংস্কৃতিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল অবরুদ্ধতায় ক্রমশ গড়িয়ে নিয়েছে, সেখানে স্পর্শকাতরমাত্রেই পলায়নবাদী সংক্ষুব্ধতায় নিজের চারপাশে নিজেরই অলজ্ঘ্য দেয়াল গড়ে তুলতে পারে! পরাবাস্তবের আড়ালে মান্নানের দৈববাস্তবতা যে দূরান্বয়ী পরোক্ষ প্রতীতির উদ্ভাস ঘটায়, সেখানে সাবদারের প্রতীক এবং অনুষঙ্গ রাজনৈতিক সমাজবাস্তবতার বিবৃতিধর্মিতায় না গিয়েও প্রত্যক্ষ সামাজিক অভিজ্ঞতায় জারিত! অনুষঙ্গের দিক থেকে সরাসরি, স্বচ্ছ ভাষা ব্যবহার করেও অস্তিত্বগত সঙ্কটকে সাদা-কালো ছাড়িয়ে বহুমাত্রায় নেবার ক্ষমতা সাবদারের কবিতার আছে। কিন্তু সেই সক্ষমতাকে মনস্তত্ত্বের বিন্যস্ত-অর্কেস্ট্রায় বাঁধবার কোনো আয়োজন ও করেনি। ব্যক্তিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অনুষঙ্গকে মনস্তাত্ত্বিক বহু স্তরে নেবার একটা প্রয়াস একই সময় দেখা যাবে ৬০-এর আরেক অল্প পরিচিত কিন্তু শক্তিধর সাহিত্যিক মুস্তফা আনোয়ারের কাজে! গীতলতা বা লিরিক কবিতার আলঙ্কারিকতা থেকে সরে কবিতানাটক, গল্পে, কবিতায় মুস্তফা যে এবসার্ড প্রবর্তনার কাজ করে আসছিল সেগুলোও অবশ্য প্রতীকের ব্যবহারে পরোক্ষ এবং প্রবর্তনায় আত্মবিলোপী। 'বিন্যস্ত-অর্কেস্ট্রা...' প্রসঙ্গে সাবদারের যে সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করলাম, ওর দীর্ঘ কবিতা পড়লেই বোঝা যায় যে তা পেরোনোর ক্ষমতা তার ছিল! মানে, প্রত্যক্ষ নাম বা ঘটনাকে প্রতীকে ভর করিয়েও বয়ানকে বহুস্তরের 'ভাঙা বয়ানে' রূপান্তরের সার্থকতা তার অতি ছোট্ট চিত্রল ক্যালিগ্রামসেও সুস্পষ্ট ছিল!

ষাটের প্রধান কবিদের সবার কবিতাতেই কি বিভিন্ন মাত্রায় এই আত্মবিলোপী, বিস্মরিত বিবরণের আভাস মেলে না? আবুল হাসানকে আত্মবিলোপী অবলোকনের অর্ধনারীশ্বর বলা হলে, সেই একই প্রাতিস্বিকতায় সাবদারকে বলা চলে আত্মবিলোপের ক্ষুদ্র সংস্করণ কিন্তু সম্পন্ন, সম্পূর্ণ। অন্য অনেকের বিস্তৃত কাজে যেটুকু, সাবদারের সংক্ষিপ্ত আয়াসেও সেটুকুই! একটা জরুরি পারদাঙ্ক। আরেকটু খোলা যাক! আত্মহনন একটা স্বেচ্ছাকৃত ছেদ। কিন্তু বিলোপনের ফলাফলটা আকস্মিকও নয়, হঠকারীও নয়।

এর গড়ানিটা সম্পন্নতায় যাবার পথেই রবিকরোজ্জ্বল। চড়াদাগে আত্মদহন, আত্মহনন, আত্মবিলোপনকে এক সামাজিক সরলরেখায় যুক্ত করা গেলেও, সূক্ষ্মদাগে ব্যাক্তিত্ববিশেষে এই প্রবণতাগুলোই কখনো রোগ, কখনো বা আয়ুধ!

একদিকে যেমন সাবদারের হিসাব মিলছে না ''স্বাক্ষরের'' আব্দুল্লাহ আবু সাইয়িদ, মান্নান সৈয়দদের অর্থোডক্সি এবং ইন্টেলেকচুয়াল এরিস্টোক্রেসির সাথে; অন্যদিকে নির্গুণ যেভাবে হেডোনিজমের ভিতরে মার্ক্সীয় ঈক্ষণের টানাপোড়েনের ভারসাম্য এনেছে, সেখানেও সাবদার নিতে পারছে না তাত্ত্বিক-যুক্তি-পাল্লার হিসাব! দহনাক্রান্ত ভ্রমণ? আত্মহনন কিছুতেই নয়! কবিতাগুলো সেখানে এক ধরনের পরম নোঙ্গর! ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে পাকিস্তানি উপনিবেশের পর্বান্তর এবং ১৯৭১-এ বাংলাদেশ প্রাপ্তি, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সাথে সীমান্তছেদ একজন ব্যক্তি সাবদারের, যে নাকি আবার সহজাতভাবেই বোহেমিয়ান, কাছে প্রচণ্ড যাতনার বিষয়! সাবদারের বাবা কোলকাতা ছেড়ে সাতক্ষীরা নামের মফস্বলে এসেছে ১৯৬৪-তে, আবার ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার প্রাক্কালে বাংলাদেশ ত্যাগ করছে স্থায়ীভাবে, যে-বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর, সাবদার সেখানে রাজধানীতে থেকে যেতে চাইছে এবং থাকছে!

বাংলাদেশের কবিতা যতটা না তার ব্রিটিশ উপনিবেশিক ধারাবাহিকতার সাথে যুক্ত; তার চেয়েও বেশি সাধর্ম, সাযুজ্যে লাতিন কবিতার সমকালীন চড়াই-উতরাইয়ের সাথে সমান্তরাল। পাকিস্তানে যোগ দেবার ভ্রান্তি থেকে ১৯৭১ অব্দি বাংলাদেশীদের সংগ্রামকে স্পেনের গৃহযুদ্ধের সাথে অনেকভাবেই তুলনা করা যেতে পারে। স্পেনের ক্ষেত্রে অবশ্য বিজয়ী শক্তি হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীলেরা, সেখানে বাংলাদেশে প্রতিক্রিয়াশীলেরা পরাজিত শক্তি এবং পরে বিভিন্ন পর্যায়ে পুনর্বাসিত। নেরুদার বিশ্বায়ন এবং লোরকার লোকগাথাজাত মিথস্ক্রিয়ায় যেভাবে লাতিন কবিতার আধুনিকায়ন; একইভাবে নাগরিক প্রবর্তনা এবং ফোকলোরের সমান্তরাল পথবন্ধন তৈরি হয়েছে ৬০-এর , ৭০-এর দশকের বাংলাদেশেও।

আবুল হাসানের 'রাজা যায় রাজা আসে' দোদুল্যমানতার পাশে নির্মলেন্দু গুণের দার্ঢ্য নায়ক 'হুলিয়া' মাথায় শহর ছেড়ে গ্রামে পালিয়ে যেতে দেখছি শহরে ফেরবার প্রত্যয় নিয়েই; এরা নাগরিকের দৃষ্টি থেকেই গড়ে তুলছে গ্রাম ও নগরের পর্বান্তরিত মেলাঙ্কলিয়া; একই মনস্তত্ত্বের সীমাসন্ধিতে অবচেতন ঘোর থেকেই আসছে মুহাম্মদ রফিকের, ''কপিলা''! এই পর্বান্তর, এই মনস্তাত্ত্বিক সীমাসন্ধির পত্তনিতে দাঁড়িয়েই সাবদার সিদ্দিকী'র উচ্চারণঃ ''হে শহর, তোমার রাস্তার জ্যামিতি/যখন কাঁপতে কাঁপতে/খানখান হয়ে ভাঙতে ভাঙতে/পিকাসোর গোর্নিকা হয়ে যায়।'

আত্মগত পিং পংঃ

১৯৮৫-তে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর, সামরিক স্বৈরশাসনের দৌরাত্ম্যে ক্লাস শুরু হতে, হতে পুরো প্রায় এক বছরের অনির্দিষ্টকালীন ছুটির ধাক্কা। সময় কাটাতাম তখন গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের ব্যস্ততায়, টি.এস.সি'তে, ঢাকেশ্বরী মন্দিরের কাছাকাছি 'শিল্পতরু' প্রেসে। রিফাত চৌধুরী তখন 'শিল্পতরু'তে আবিদ

আজাদের সহকারীর চাকরি ছেড়ে দেয়াতে সে-কাজটা নিয়েছে আহমেদ মুজিব (কচি)। আমার, কচির বাসা ছিল আজিমপুর কবরস্থান আর চায়না বিল্ডিঙের মাঝামাঝি। গাঁজা সেবনার্থে আমার, রিফাতের, কাজলের আরেক নিয়মিত গন্তব্য ছিল পিলখানার বি.ডি.আর. গেইটের কাছের বয়রার আড্ডা। দশাসই, দোহারা গড়নের, লুঙ্গিপরা, সবসময় খালি গা বয়রা ছিল বনেদি ভারি কাঠের আসবাবপত্রের কারিগর এবং আবগারির অনুমোদনপ্রাপ্ত গাঁজাবিক্রেতা। আশির প্রবর্তনামূলক ''ভাঙা লিরিক'' সহ অনেক কাজেরই শিল্পসুরাহা হয় ঐ বয়রার সার্কিটেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগেই অবশ্য যমজ বোন কঙ্কণের (নাতাশা হাবিব) চারুকলাতে ছাত্রী হবার সুবাদে ৮২'থেকেই চারুকলার সামনের মোল্লার চায়ের দোকানে আনাগোনা শুরু হয়েছিল। এসবের মধ্যে সাবদারের সাথে প্রথম দেখা হয়েছিল টি.এস.সি'র টেবিল টেনিস কক্ষে!

সাবদার রাতে ঘুমাতেন ঐ পিং পং টেবিলে। দেখা হল, আমি বললামঃ আবিদ ভাই'র ড্রয়ারে আপনার ক্যালিগ্রাম দেখলাম। উত্তরে উনি বলেলনঃ হ্যাঁ আবিদ তোমার কথা বলছিল। আশিতে আবিদ আজাদ স্বৈরতন্ত্র সমর্থক কবিতাকেন্দ্রে যোগ দেবার কিছুদিন পর 'শিল্পতরু'র ছাপাখানা ঢাকেশ্বরী থেকে সরে কাঁঠালবাগানে চলে যায়। এ-পর্বে আমরা অনেকেই যেমন, তেমনি সাবদারও আবিদ আজাদের সাথে যোগাযোগ কমিয়ে দেন। একবার বললাম যে পিং পং টেবিলে ঘুমান, খেলতে পারেন? ভাঙা চোয়ালে, হালকা দাড়ি আর তৈমুরি মোচের নিচে একটা মুচকি হাসি এসব রসঘন সময়ে দেখা যেত। প্রায়ই আমি একটা সিনেমার শুরুটা কল্পনা করিঃ বয়রা একটা পিং পং টেবিল বানিয়ে দিল; দুপাশ থেকে খেলছি সাবদার আর আমি; বলটা ছিটকে কোথায় যেন উড়ে গেল; আমি বিদেশগামী উড়োজাহাজে বিড়বিড় করছিঃ আরে বাওয়া, বল কি শুধু একটাই? যেদিকেই যাই, অসংখ্য পিং পং গ্রহ-নক্ষত্র-ঝলমল-সাবদারি-রাশিফল!

পুরান ঢাকার বুলবুল ললিতকলা একাডেমিতে ভাস্কর রাশার কাছে সাবদারের নিয়মিত যাতায়াত নিয়ে পুলক হাসান লিখেছিল, ''তরুণ ভাস্কর রাশার সাথে সাবদারের সম্পর্ক ছিল অভ্যাসগত। আর মরহুম ওস্তাদ ফজলুল হকের সাথে গুণীর সম্পর্ক...। ফজলুল হক তখন বুলবুল ললিতকলা একাডেমির উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিক্ষক আর রাশা তখন এ-একাডেমির পশ্চিম পাশের একটা কক্ষে নিয়মিত কাঠের বাটালি ছেনে ভাস্কর্য তৈরি করেন। আর প্রতিদিন বিকেল থেকে রাত নটা-দশটা অব্দি একঝাঁক তরুণের উপস্থিতিতে আড্ডা জমাতেন। এ-আডায় শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে খোলামেলা আলাপ-আলোচনা থেকে রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়েও মত বিনিময় হত। ''এই পুলকই সাবদারের মৃত্যুর পর 'দৈনিক ইনকিলাব' এর ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫ সংখ্যায়, ''সাবদার সিদ্দিকীর মৃত্যুঃ এক নগরবাউলের প্রস্থান'' শীর্ষক স্মৃতিকথায় এক চমৎকার লেখচিত্র এঁকেছিল, ''দেখতে অবিকল তরুণ সাধু কি সন্তের মতো। লম্বাটে মুখ, ভাঙা চোয়াল, ঈগল ঠোঁটের ন্যায় নাক আর কোনো তরুণের মতোই ঘাড় অবধি নেমে যাওয়া একমাথা চুল। মুখে একগোছা পাতলা দাড়ি... ক্লান্ত চোখ জোড়া কোটরাগত, কিন্তু দূর স্থির লক্ষ্যে আগুনের মতো প্রজ্বলিত। কাঁধে ঝোলা

সে তো নিমিত্ত। হালকা-পাতলা ছিপছিপে গড়নের সাদামাটা এ মানুষটি এত তেজ ধরেছিলেন বুকে-মনে। ভাবাই যায় না, যেন তার নির্মোহ আদর্শের কাছে হিমালয় পর্বত পর্যন্ত অবনত।''

বিজড়িত নৌকার বাইচ:

সাবদার নিয়ে নিজের উত্তেজনা কানাডাপ্রবাসী অনুজ কবি মেসবাহ আলম অর্ঘ্য'র সাথে সম্প্রতি ভাগযোগ করে এক যৌথ অনুবাদ প্রকল্প হাতে নেবার সময় নিজের প্রতি প্রশ্ন করেছিলাম যে সাবদার ঘিরে কেন এই তাগিদ?

সাবদারকে নিয়ে আগ্রহের পেছনে কেবলই বোহেমিয়ান যাপন বা নৈরাজ্যিক প্রকাশভঙ্গি প্রণোদনা হিসেবে কাজ করেনি! এর পেছনে রয়েছে ৫০-এর দশক থেকে বাংলাদেশের সাহিত্যের প্রমিত পত্তনির যে কাজ হয়েছে তার পারম্পর্যের প্রতি উৎসাহ!

'আসাদের শার্ট' লিখে শামসুর রাহমান বাংলাদেশের কবিতার বয়ান, চিত্রকল্প, উৎপ্রেক্ষা হেঁচকা টানে জীবনানন্দীয় আবহ থেকে সরিয়ে এনেছিলেন যে পত্তনিতে দাঁড়িয়ে তার বীজতলা তৈরি হয়েছিল আরো আগে। ঢাকার আজিমপুর ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুলে 'জীবন আমার বোন' খ্যাত কিশোর মাহমুদুল হককে আবিষ্কারের পর খণ্ডকালীন তরুণ শিক্ষক শহীদ সাবের তাকে নিয়ে যান, দৈনিক 'ইত্তেহাদের' সম্পাদক আহসান হাবীবের কাছে। মাহমুদুল হকের প্রথম কাজটা ছাপানো ছাড়াও একের পর এক সম্পাদকীয়তে যে গদ্যভাষার বুনট আহসান হাবীবেরা ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন তার ভিতরেই লুকায়িত পঞ্চাশের ভূমার একটি অংশ। পিরোজপুরে জন্ম হলেও আহসান হাবীবের সাংবাদিক জীবনের শুরু কোলকাতায়। মাহমুদুল হক, শহীদ কাদরী, মান্নান সৈয়দদের পরিবার ভারতভাগের পর যখন বাংলাদেশে এসেছে, তখন উল্লেখিতরা কিশোর অথবা বালক। আহসান হাবীবদের শিক্ষানবিশি কোলকাতায় হলেও, তার সমান্তরালেই ঢাকাতে আরো ব্যাপকতর সার্বভৌম প্রমিত পত্তনির কাজ করে আসছিল বেশ কয়েকজন যার পরিস্ফুটন দেখতে পাওয়া যায় পঞ্চাশের নাটকে, কবিতায়, উপন্যাসে, চলচ্চিত্রে।

পূর্ববাংলার জল, কাদায় পুষ্টিসার গ্রহণ করা এই দ্বিতীয় দলটাকে নিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সবসময়ই সন্ত্রস্ত ছিল। পুরোপুরি বাংলাদেশের অনুষঙ্গে অথচ বিশ্বায়িত প্রবর্তনার ধারক শহীদুল্লাহ কায়সার, জহির রায়হান, মুনীর চৌধুরীদের বিচিত্রমুখি পরিশীলনে যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা সাহিত্য-শিল্পপ্রয়াসী কিশোর সাবদারেরা সংক্রমিত হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। অভিবাসীর বাস্তুহারা মনস্তাত্ত্বিক দর্পণ আবার বুদ্ধিবৃত্তিক বাস্তু খুঁজে পেয়েছিল এই স্বাগতিক দ্বিতীয় দলের প্রত্যয়পূর্ণ সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ভেতর।

গোল্লার ছুট:

সাবদার সিদ্দিকীর জন্ম ১৯৫০-এর কোলকাতায়। ১৯৬৪-তে ধর্মীয় দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে সাবদারের বাবা আইন ব্যবসায়ী গোলাম মাওলা সিদ্দিকী সপরিবারে

সাতক্ষীরায় চলে আসেন। পাঁচ ভাই-বোনের সংসারে সাবদার একমাত্র ছেলে। ১৯৭১-এ সাবদারের বাবা সাতক্ষীরার আইন ব্যবসায় চুকিয়ে দিয়ে আবার কোলকাতায় সপরিবারে স্থায়ীভাবে ফিরে যান। সাবদার তখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। পরিবারের সাথে কোলকাতায় না ফিরে সাবদার মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে আট নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেন। পরে কোলকাতায় ফিরে প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক 'স্বদেশ'। ১৯৭২-এ কোলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরে 'স্বদেশ'-এর আরো ৪টি সংখ্যা প্রকাশ করেন।

এই ফেরার পর আর বসবাসের জন্য কোলকাতায় ফিরে যাননি। নিজের ধরনে, নিজের ঈক্ষণে ঢাকাতে এক বোহেমিয়ান-বাউলের যাপন। দু' একটা বিজ্ঞাপন সংস্থায় এবং দৈনিক 'আজাদে' অত্যল্প সময় কাজ ছাড়া বাদবাকিটা স্বাধীন জীবন। মুক্তিযুদ্ধ তার সাথে তার কবিতাকেও বদলে দিয়েছিল। নিজস্ব ধরনের চটের আলখাল্লা, ক্যানভাসের প্যান্ট, গোল চশমা, কখনো খালি পা, কখনো খড়ম পায়ে তাকে দেখা যেত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে, পুরানো ঢাকার বুলবুল ললিতকলায়। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে কবিতা, ক্যালিগ্রাফি, বিভিন্ন রকম পত্রিকার পরিকল্পনা এবং মাটির একটা থালাবাটি। তুমুল আড্ডাবাজ এবং ন্যূনতম সরঞ্জামে প্রচণ্ড ভ্রমণপ্রিয় এক সন্ন্যাসী। কারো সাথে নীড় পাতার কোনো আকাঙ্ক্ষার আভাষ কখনো পাওয়া যায়নি।

আমরা জানতে পাই ১৯৯৪ সালে সাবদার ঘুরতে, ঘুরতে দিল্লি চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতা নিয়েই বাংলাদেশে ফিরতি যাত্রা শুরু করেন। সীমান্তবর্তী সাতক্ষীরার কাছে ভারতীয় এলাকায় তার মৃত্যু ঘটে এবং নামহীন এক গ্রামে তাকে সমাহিত করা হয়। 'নামহীন গ্রাম'? Nomans land কি? দুইপারের সীমান্তরক্ষীদের ধাওয়া-পালটা-ধাওয়ার শিকার হয়েছিলেন কি? পাসপোর্ট নিয়ে ভ্রমণ করতেন না সাবদার! কোলকাতার জীবিত স্বজনদের DNA বা রক্তলতা সংগ্রহ করে, সীমান্তবর্তী কবরগুলো খুঁড়ে সনাক্তকরণ নিশ্চিত না করা হলে বিস্তারিত আমরা কখনোই আর জানতে পারব না! সেটা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অসম্ভব হলেও, পরিস্থিতিজাত ভাষিক-বীজতলাগুলোর রক্তলতা চিহ্নিত করতে পারলে আমরা হয়তো বাংলাদেশের বাংলা ভাষার মানপত্তনির হারানো ছোটবড় যোগসূত্রগুলো নির্ণয় করতে পারব!

জুলাই/নভেম্বর ২০১২, ব্রিটানি, ফ্রান্স।

সূত্রঃ

১. সাবদার সিদ্দিকীর ব্যক্তিগত সঙ্গ।

২. সাবদারের ঘনিষ্ঠ রাশা, আনোয়ার ফরিদি, তারিকুল আলম খানের সাথে কথোপকথন।

৩. পুলক হাসানের মুদ্রিত লেখা।

৪. আবিদ আজাদ সম্পাদিত 'শিল্পতরু' থেকে ক্যালিগ্রামস।

৫. 'ঘাস ফুল নদী' থেকে মাহবুব কামরান, মুনীর মোরশেদ প্রকাশিত, আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, ''সাবদার সিদ্দিকী কবিতাসংগ্রহ"।

[লেখক: কবি ও নাট্যকার। বর্তমান নিবাস: ব্রিটানি, ফ্রান্স।]

কবি সাবদার সিদ্দিকী

আ ল ম গী র রে জা চৌ ধু রী

গায়ের রঙ শ্যামলা, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, লিকলিকে শরীর, অবিন্যস্ত চুল, কথায় ইংরেজির তুবড়ি ছুটছে। সলবেলোর উপন্যাস 'হেন্ডারসন দ্য রেইন কিং' থেকে ডিলান টমাসের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বাংলা কবিতার সর্বশেষ গতি-প্রকৃতি উদ্ধারে প্রাণান্তকর চেষ্টায় রত। রেখায়নের আড্ডায় রাগীব হোসেন চৌধুরী পরিচয় করিয়ে দিলেন কবি গোলাম সাবদার সিদ্দিকীর সঙ্গে, পরবর্তীতে 'গোলাম' শব্দটি বর্জন করেছিলেন। ব্যস, দ্বিতীয় বাক্য বলার প্রয়োজন মনে করলেন না। 'দিল্লি বহুত দূরস্থ'। উদাসীন চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে ভারতের তৈরি টেণ্ডুপাতার বিড়িতে কষে টান দিয়ে বিরক্তি সুরে বলে, 'কবিতা লেখে নির্মল, তুমি লিখে কী করবে। পড়াশোনা করগে।' আমার ধারণা, সাবদার ভাইয়ের ওইদিন মুড ভালো ছিল না। সাদামাটা এক তরুণের চেয়ে সলবেলো অথবা ডিলান টমাসের জগতে বিচরণ করতে চেয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে আহত হলেও আমি তার কবিতার ভক্ত। ভক্তহৃদয় কিঞ্চিৎ বিগলিত হয়। আমি বলি, "সাবদার ভাই, 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত আপনার কবিতাটি আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। আপনাকে ধন্যবাদ।" সাবদার ভাই প্রচুর চা খেতে পারতেন, সঙ্গে যে কোনো ব্র্যান্ডের সিগারেট। আমি দৌড়ে পাপ্পুতে গেলাম। চায়ের কথা বলে এক প্যাকেট নীল রঙের প্লেইন স্টার সিগারেট নিয়ে এসে তার হাতে ধরিয়ে দিলাম। রেখায়নের মধ্য রুম সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। অল্প আলোতে আমি সাবদার ভাইয়ের পাশে বসে গেলাম। রাগীব ভাই মুচকি হাসলেন। 'মধ্যরাতে আমার ছায়াও কেঁপেছিল, শহরের নিষিদ্ধ পোস্টারে, কুকুরের জ্বলন্ত চোখে, ভিখিরির নিভন্ত আগুনে, আত্মপ্রতিকৃতি আবিষ্কার করেছি বহুবার, শুধু ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে টিকটিক বেঁচে আছি এই বুর্জোয়া শহরে।'

'তোমার তো দারুণ মুখস্ত শক্তি। ভালো, ওয়েল এন্ড গুড।' বোলফোটা পাখির মতো কবি সাবদার সিদ্দিকীর মুখে কথার ঝরনা বয়ে চলছে। রেখায়নের প্রোপাইটর রাগীব হোসেন চৌধুরী চোখের ইশারায় আমাকে বোঝালেন, ও এই রকমই। সাবদার ভাই মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ওই রকম ছিল। সদাহাস্য, প্রাণখোলা, বাকপটু, উদাসীন, উদ্বাস্তু এবং জন্ম-বোহেমিয়ান। প্রথম পরিচয়ের পর মুহূর্ত থেকে তার হৃদয়িক উষ্ণতার স্পর্শ পেতে শুরু করি। উল্লেখ্য, বিরক্তও কম হইনি। বলা যায়, প্রথাসিদ্ধ জীবনপ্রণালীতে সাবদার ভাই একটি বিরক্তিকর চরিত্র। '৭৩ সালে ঢাকা কলেজ থেকে কোনও এক কারণে বহিষ্কৃত ছাত্রদের চারজনের আমিও একজন ছিলাম। অগত্যা তেজগাঁওয়ে ভর্তি হই। থাকি ইন্দিরা রোডে। মধ্যরাতে রেখায়নের আড্ডা শেষ করে

বাসায় ফিরতে গেলে সাবদার ভাই সঙ্গী হত। সাবদার ভাই পারিবারিক পরিবেশে বেমানান চরিত্র। মফস্বল থেকে এসে আমি তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারিনি। বিরোধ হয়েছে। কবিতার অন্তঃশীলা ফল্গুধারায় অবগাহন করতে করতে আবার আমার ডেরায় সাবদার ভাইকে নিয়ে এসেছি। কবি সাবদার সিদ্দিকীর পিতৃপুরুষ কোলকাতা নিবাসী। কোলকাতার কোনও এক কনভেন্টে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিল। তারপর কাব্যমাতাল কবি অজানা এক পথে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিল, যা মৃত্যুর মধ্যদিয়ে সাড়ে তিন হাত মাটিতে স্থায়ী নিবাস করে নিয়েছে। কবি পুলক হাসান একটি দৈনিকের পাতায় কবি সম্পর্কে একটি জীবনপঞ্জি দিয়েছেন, তা এখানে উল্লেখ করলাম। জন্ম: ১৯৫০। কোলকাতা। পৈতৃক নিবাস: বশিরহাট, চব্বিশ পরগনা।

পিতা : গোলাম মাওলা সিদ্দিকী। আইন ব্যবসায়ী। ভাই-বোন : চার বোন এক ভাই। গোলাম মাওলা সিদ্দিকীর পাঁচ সন্তানের মধ্যে সাবদার ছিলেন দ্বিতীয় সন্তান এবং একমাত্র পুত্রসন্তান।

বাংলাদেশে আগমন : ১৯৬৪ সালে কোলকাতায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে গোটা পরিবার সমেত সাবদার তার পিতার কাছে চলে আসেন সাতক্ষীরায়। সাবদার তখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। পিতা গোলাম মাওলা সিদ্দিকী ১৯৬৪-৭১ সাল পর্যন্ত সাতক্ষীরায় আইন ব্যবসা করতেন।

মুক্তিযুদ্ধে যোগদান : ১৯৭১ সালে গোটা পরিবার আবার কোলকাতায় চলে যায়। শুধু সাবদার থেকে যান এদেশে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে সাবদার সিদ্দিকী আট নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেন। পরে কোলকাতায় চলে যান। কোলকাতা থেকে প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক 'স্বদেশ'।

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড : ১৯৬৪ সালে অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে সাবদার সিদ্দিকী সাহিত্য সংগঠন 'কোরক'-এর সহসাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর সাতক্ষীরা থেকে প্রকাশিত দেশাত্মবোধক কবিতা সংকলন 'অনন্য স্বদেশ'-এ সাবদারের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়।

১৯৭১ সালে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় কোলকাতা থেকে সাপ্তাহিক 'স্বদেশ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৭২ সালে কোলকাতা থেকে ফিরে এসে সাপ্তাহিক 'স্বদেশ'-এর চারটি সংখ্যা প্রকাশ করেন। সাবদার সিদ্দিকীর কবিতা সংকলিত দু'তিনটি ছোট পুস্তিকা বা সংকলন প্রকাশিত হয়। 'পা', 'গুটি বসন্তের সংবাদ', 'সোনার হরিণ' প্রভৃতি।

মৃত্যু : ১৯৯৪। জীবনের শেষ পর্বে দিল্লিতে অসুস্থ। অসুস্থতা নিয়ে কোলকাতায় ফিরে আসেন। বাংলাদেশে চলে আসার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। সেই উদ্দেশে ফিরে আসতে গিয়ে সাতক্ষীরার কাছে বাংলাদেশের সীমান্তের ওপারে এসে তার মৃত্যু ঘটে। একাকী। নামহীন এক গ্রামে সমাহিত।

এসব তথ্য কোনোদিন সাবদার ভাইয়ের মুখ থেকে সঠিক জানা যায়নি। সবকিছুতেই ছিল বিবমিষা টাইপের উত্তর। আগ্রহ পোষণ করিনি; বরঞ্চ কবি সাবদার সিদ্দিকীর কাব্যসুষমা আমাকে টেনেছিল বেশি। সাবদার সিদ্দিকী খুব বেশি লেখেননি। জীবিত অবস্থায় তার কোনও গ্রন্থ বের হয়নি।

হঠাৎ হঠাৎ একটি লিটল ম্যাগ সম্পাদনা করতেন। পা, গুটি বসন্তের সংবাদ ইত্যাদি। লিটল ম্যাগের চরিত্রের সব গুণাবলি কাগজগুলোতে বিদ্যমান থাকত। সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ওই পর্যন্তই। আর লেখালেখি, অত্যন্ত হিসাব-নিকাশ করতেন। এক্সপেরিমেন্টের দিকে ঝোঁক ছিল। সস্তা নামের প্রতি মোহহীন। বরঞ্চ কবিতার শরীরে প্রকরণগত বৈচিত্র্য খুঁজে বেড়াতেন– ইতিহাস, দর্শন, যাপিত জীবনের সূক্ষ্মতর নান্দনিকতা। প্রথমে বলেছি, কবি সাবদার সিদ্দিকী জন্ম-বোহেমিয়ান। ঘর-সংসার-নারী ইত্যাকার বিষয় নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তার কবিতার একটি লাইন এমন 'সন্ন্যাসীর লিঙ্গের মতো নিস্পৃহ'। কোলকাতা বেড়ে ওঠা নিয়ে তার একটি বিখ্যাত কবিতা আছে। কোলকাতার 'হাওড়া' ব্রিজ যেন লোহার ব্রেসিয়ার। এরকম অনেক অমর কবিতা লিখে গেছেন। জীবনযাপনে উদাসীনতার কারণে সামাজিক সম্মানের চেয়ে অনাদর বেশি পেয়েছেন। এমনকি জীবিতকালে তার কোনো কবিতার বই বের হয়নি। এ ব্যাপারে কবি সাবদার সিদ্দিকীর উদাসীনতা কম দায়ী নয়। মৃত্যুর বেশ পরে কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কবি সাবদার সিদ্দিকীর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা রচনা সংগ্রহ করে একটি গ্রন্থ বের করেছেন সৃজনশীল প্রকাশনী 'ঘাস-ফুল নদী'। কবি আবদুল মান্নান সৈয়দের এ কর্মটি একজন তরুণ কবির প্রতি তার গভীর ভালোবাসা। ব্যক্তিগতভাবে আমি মান্নান ভাইয়ের কর্মটির প্রতি সম্মান জানাচ্ছি।

তার মৃত্যুতে আমি অবাক হইনি। এ রকম একজন জাত কবিপুরুষের স্বেচ্ছাচারী যাপিত জীবনের ফসল কিছু কবিতা, ক্যালিগ্রাফি। আর তার মৃত্যুতে বাংলা কবিতার ক্ষতি হয়েছে।

সাবদার ভাই, সত্যি দেখা হবে। হাসান ভাইয়ের ভাষায়– মানুষ তো মূলত বিরহকামী।

আর আপনার তো অভিমান একটু বেশি, তাই সাততাড়াতাড়ি চলে গেলেন। কবিতা লিখবে কে?

[লেখক: কবি। প্রাবন্ধিক। সাংবাদিক।]

গোলাম সাবদার সিদ্দিকী: কোন কাননের ফুল

শ হি দ উ ল্লা হ স বু জ

কোলকাতার রিপন স্ট্রিটের বাসিন্দা গোলাম সাবদার সিদ্দিকী বাংলাদেশে অনেকের কাছেই খুব একটা পরিচিত নাম না হলে কী হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পরই তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের একটা গ্রুপকে ট্রাক চালিয়ে কোলকাতা থেকে ঢাকা এনে অতি অল্পসময়ে ঢাকার সাহিত্যামোদী অনেকের কাছে প্রিয় মানুষে পরিণত হন।

কবি নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, অসীম সাহা, রবিউল হুসাইন, শাহাদাত বুলবুল, সুরাইয়া খানম, রুদ্র মোহাম্মদ শহীদউল্লাহসহ অনেকেই তাঁকে পছন্দ করতেন তাঁর বিচিত্র বেশভূষা ও উঁচুমার্গের আলোচনা, বিশেষ করে সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ দখলের কারণে।

উপমহাদেশের মানুষ, সংস্কৃতি, সভ্যতা, নৃতত্ত্ব এবং এ এলাকার মানুষের জীবন যাপনের বিষয়ে গোলাম সাবদার সিদ্দিকী ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টবাদী একজন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। প্রচলিত সমাজ-সভ্যতার অনৈতিক আচার-আচরণ সম্পর্কে সাবদার সিদ্দিকী ছিলেন অত্যন্ত মুখর এবং এককথায় নীরব প্রতিবাদী।

চুয়াত্তর সালে ঢাকার নিউমার্কেটে মনিকো রেস্টুরেন্টে তাঁর সাথে বাংলাদেশের অনেক কবি-সাহিত্যিকের আলাপ-পরিচয় ঘটে। আমি তখন ঢাকা কলেজে অনার্সের ছাত্র। ঢাকা কলেজের নর্থ হোস্টেলে একশত দুই নম্বরের রুমে আবাসিক ছাত্র। আমার সাথেও মনিকোতে তাঁর প্রথম পরিচয়। সাবদার সিদ্দিকী আমার সাথে পরিচয়ের প্রথম দিন থেকে প্রায় দেড় বছর অস্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করেন। ঢাকায় তাঁর স্থায়ী কোনো থাকার জায়গা ছিল না। তাই হঠাৎ রাত এগারটা কি বারটায় এসে আবার সূর্য ওঠার আগে কাউকে কিছু না বলে কোথায় চলে যেতেন। হয়তো একদিন দুইদিন, এমনকি কখনো কখনো সাত/আটদিন পরও আবার হঠাৎ করে সাবদার আমার রুমে এসে হাজির। কাউকেই তিনি কোনো কৈফিয়ৎ দিতে পছন্দ করতেন না।

কোনো নিয়মনীতিও মানতেন না তিনি। ইচ্ছা হলে কথা বলতেন অথবা আমার রুমের পুবদিকের জানালার পাশে চেয়ার নিয়ে পুব আকাশের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকতেন।

ঢাকা মেট্রোপলিটান সিটি ঘোষণা করলে তিনি আমাকে বললেন একটা কবিতা সংকলন বের করতে হবে। কবিতা সংকলনটির নামও তিনি নিজে নিজেই ঠিক করে ফেললেন। এ সংকলনটির নাম হবে মেট্রোপলিটান কবিতা সংকলন। যেই কথা সেই

কাজ, এক রাতের মধ্যে তিনি এ সংকলনের জন্য বেশ কিছু কবিতা লিখে ফেলেন। সংকলনের কয়েকটি কবিতা-এ রকম–

মানুষ মহাশূন্য করায়ত্ত করেছে সত্য
কিন্তু মানুষের সাথে মানুষের দূরত্ব আজো
ঘুচাতে পারেনি"।

অন্য আর একটি কবিতা হাইকোর্টের নুরা পাগলাকে নিয়ে। নুরা পাগলার খ্যাতি তখন তুঙ্গে। সাবদার সিদ্দিকী নুরা পাগলাকে নিয়ে একশত লাইনের একটি কবিতা লিখেছিলেন। এ সংকলনে 'নুরা পাগলা' কবিতার বিশেষ অংশ ছাপা হয়েছিল–তা এরকম–

'চুর-চুর-চুর সব
ভাংচুর সব
নুর নুর নুরা পাগলা।

কবিতা সংকলনটির সম্পাদনায় ছিলেন সাবদার সিদ্দিকী নিজে। সহযোগিতায় আমার নাম ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রযোজক আতিকুল হক চৌধুরীর একমাত্র ছেলে এনামুল হক কাইয়ুমের নাম ছাপা হয়েছিল। এ সংকলনে আমরা বাংলা মটরের ওখানে অফিসের একটা চা কোম্পানির এক হাজার টাকার একটি বিজ্ঞাপনও পেয়েছিলাম। সাবদার সিদ্দিকী আমাকে এবং কাইয়ুমকে কিছু না জানিয়ে বাংলা মটর থেকে সেই চা কোম্পানির অফিস থেকে টাকা তুলে সোজা কোলকাতায় পাড়ি জমিয়েছিলেন। এ ঘটনার প্রায় এক মাস পর সাবদার আবারো আমার রুমে একদিন রাত্রে এসে হাজির। যেদিন তিনি কোলকাতা থেকে ফিরলেন–সে দিনই সাবদার আমাকে বললেন যে-বিখ্যাত প্যারডি লেখক নিয়ামত হোসেন তাঁর সাক্ষাৎ মামা। কোলকাতার রিপন স্ট্রিটে ছিল সাবদার সিদ্দিকীর বাসভবন। তাঁর বাবা-মা-বোনদের নিয়ে ছিল তাঁদের সংসার। সাবদার সিদ্দিকীর বাবা ছিলেন কোলকাতার একজন নামকরা আইনজীবী। শবনম ছিল সাবদার সিদ্দিকীর অতি আদরের ছোট বোন। সেই বোনের জন্য আমার রুমে সাবদার সিদ্দিকীকে বাচ্চা শিশুর মতো কাঁদতে দেখেছি।

ঘষা কালো কাচের একটি চশমা তখন প্রায়ই সাবদার সিদ্দিকীর নাকের ডগায় প্রায়ই দেখা যেত। কাঁধে চটের তেল চিটচিটে ব্যাগভর্তি খবরের কাগজ, বই নিয়ে কখনো খালি পায়ে, কখনো কুমিল্লার খড়ম পায়ে দিব্যি ঢাকা শহর ঘুরে বেড়াতেন।

চুয়াত্তরের কোনো এক সময়ে একবার 'দৈনিক সংবাদে'র ভেতরের পাতায় তাঁর সুন্দর মুখের কাঁধে ব্যাগ, বসা অবস্থায় একটি ছবি ছাপা হয়। ছবিটির ক্যাপশন হেডিং ছিল "কে এই সাবদার সিদ্দিকী"। প্রচুর বই পড়তেন, কথা বলতেন অন্যকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে। আর তিনি যে কথা বলতেন তাঁর কথা শুনতে হত চুপচাপ। যে কোনো বিষয়ে তিনি বাংলা অথবা ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলতেই ভালোবাসতেন। একবার কোলকাতা থেকে ঢাকা এসে আমার হাতে একটি ছোট কবিতার বই দিলেন। বইয়ে সর্বমোট ছাপানো কবিতার সংখ্যা ছিল সাত কি আটটি।

কবিতার বইয়ের প্রথম কবিতা ছিল– এ রকম–

"প্রয়োজন তত নেই খাদ্যের
প্রয়োজন–প্রিয়জন
প্রয়োজন চাই শুধু সত্যের"

বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ না করলে কী হবে, এদেশকে প্রচণ্ডভাবে ভালোবাসতেন গোলাম সাবদার সিদ্দিকী। কোলকাতা গিয়ে পুনরার ঢাকা চলে আসলে একবার আমি তাঁকে প্রশ্ন করি–কোলকাতায় মন বসাতে পারলেন না– তিনি আমার দিকে মিষ্টি হেসে উত্তর দিলেন– কোলকাতা অনেক পুরনো শহর, আর ঢাকার বাতাস, তিনি বললেন– জাপানি কাপড়ে ঢাকা, হে আমার ঢাকা। এর রসে শ্বাস নিতে কোনো কষ্ট নেই।

একবার খুলনা কারাগারে একুশে ফেব্রুয়ারির দিনকয়েক আগে সাবদার সিদ্দিকীকে ছয়-সাতদিন থাকতে হয়েছিল। সে সময়ে তিনি অন্যান্য কয়েদিদের নিয়ে কাদামাটি দিয়ে শহিদ মিনার বানিয়ে জেলের ভেতরের ড্রেনের পাশের লতাগুল্মের হলুদ ফুল দিয়ে শহিদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়েছিলেন।

এছাড়া অন্য আর একবার, ঢাকার নিউমার্কেটের ১নং গেটের উল্টা দিকে যেখানে আজিমপুর গোরস্তান সেখানের দেয়ালের ইট ভেঙে দেয়ালের ওপারে যাবার অপরাধে পরদিন সকালে প্রিজন ভ্যানে করে যখন তাঁকে কোর্টে চালান করে নিয়ে যাচ্ছিল। সৌভাগ্যবশত! আমি আর প্রকৌশলী কবি শামসুর রেজা ঐ পথ দিয়ে যেতে জ্যামে আটকে পড়া প্রিজন ভ্যান থেকে সাবদার আমার নাম ধরে ডেকে উঠলে আমি যখন সাবদারকে পাল্টা প্রশ্ন করি– তখন তিনি বললেন– ভয় নেই, আমি দুই তিনদিন পর ফিরে আসব। ঠিকই ২/৩ দিন পর সাবদার সিদ্দিকী জেল থেকে ছাড়া পান। ছাড়া পেয়ে তিনি এ সম্পর্কে একটি কবিতা লিখেছিলেন– কবিতাটি তখন 'দৈনিক বাংলা'য় পরদিন ছাপা হয়–কবিতাটি ছিল এরকম–

"প্রিজন ভ্যান থেকে
পৃথিবীর কতটুকু দেখেছ তুমি"

প্রয়াত কবি নাসিমা সুলতানা মৃত্যুর দুই-তিন মাস আগে সাবদার সিদ্দিকী সম্পর্কে একটি পাণ্ডুলিপি তৈরির জন্য আমাকে তাঁর বাসায় ডেকে নিয়ে তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের অনেক কাহিনী শোনেন ও নোট করেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সেই কবি নাসিমা সুলতানাও আমাদের ছেড়ে চলে যান। গোলাম সাবদার সিদ্দিকী দৈনিক পত্রিকার বুকে কিছু কিছু ক্যালিওগ্রাফি এঁকেছেন, যা শিল্পগুণে অনন্য। এছাড়া গোলাম সাবদার সিদ্দিকীর জীবনের এমন অনেক বর্ণাঢ্য অধ্যায় রয়েছে যা সুধী মহলে প্রকাশিত হলে আমরা একজন গুণীজনকে আরো কাছে ফিরে পাব বলে আমার বিশ্বাস।

সেই সময়ে ক্ষমতাসীন সরকার এই নুরা পাগলাকে আটক করে জেলে পাঠালে একদল তরুণ ভক্ত ক্ষেপে গিয়ে, কয়েকটি সংবাদপত্রে এই মর্মে প্রেস রিলিজ পাঠায় যে, অবিলম্বে নুরা পাগলাকে মুক্তি না দিলে তরুণ ঐ ভক্তরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলের সম্মুখে থেকে কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে যাবে।

এই সংবাদ প্রকাশ হলে নুরা পাগলাকে নিয়ে দেশব্যাপী দারুণ হৈ চৈ পড়ে যায়। সেই থেকে নুরা পাগলা হয়ে ওঠে বিশেষ ব্যক্তি। সে সময়ের তরুণরা যারা হাইকোর্টের

মাজারে নুরা পাগলার আস্তানায় যেত–তারা নিয়মিত যে গানটি হাততালি দিয়ে গাইতো তা হলো–

হাই কোর্টে যাবো না
গাঁজা আর খাবো না
বাবায় মানা কইরাছে

অথবা জনপ্রিয় পপশিল্পী আযম খানের সেই গান–

ঘর করলাম না রে আমি
সংসার করলাম না
না- না– না
হাই কোর্টে যাবো না
গাঁজা ...ইত্যাদি।

হাইকোর্টের মাজারে
কত ফকির ঘুরে
কয়জন আসল ফকির
জান না।

[লেখক: প্রাবন্ধিক।]

সাবদার সিদ্দিকী : পুনর্পাঠ

পু ল ক হা সা ন

যেখানেই পা রাখি
ভিন গ্রহে কিংবা ভিন গাঁয়ে দেখি
পায়ের নিচে টুকরো দুই জমি
হয়ে যায় আপন মাতৃভূমি

চির ভ্রামণিক কবি সাবদার সিদ্দিকী (১৯৫০-১৯৯৪) তাঁর চুয়াল্লিশ বছরের সংক্ষিপ্ত উদ্বাস্তু উন্মূল জীবনকে রঙিন বেলুনের মতো উড়িয়ে দিয়ে গত হয়েছেন আজ একুশ বছর। ১৯৯৪ সালে ঘুরতে ঘুরতে দিল্লি গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কোলকাতা হয়ে ঢাকায় ফেরার পথে সাতক্ষীরা সীমান্তে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই নাম না জানা এক গ্রামে সমাহিত হন। সাবদার সিদ্দিকী প্রকৃত একজন কবি ছিলেন। কিন্তু দেশের উল্লেখযোগ্য কোনো কবি ছিলেন না। তাঁর প্রথম কবিতা ১৯৬৫ সালে সাতক্ষীরা থেকে প্রকাশিত দেশাত্মবোধক কবিতা সংকলন 'অনন্য স্বদেশ'-এ ছাপা হয়। সে-হিসেবে তিনি ষাটের দশকের কবি। আবার বয়স বিবেচনায় তাঁকে বেঁধে দেয়া যায় সত্তরেও। কিন্তু এই সময়ে একজন প্রথম দশকের কবির যেখানে গ্রন্থের ছড়াছড়ি সেখানে 'পা', 'গুটি বসন্তের সংবাদ', 'সোনার হরিণ' নামের কয়েকটি ক্ষুদে কবিতা সংকলন ছাড়া তাঁর শক্ত বাঁধাই ও পুরো মলাটের কোনো কবিতাগ্রন্থই নেই। যদিও এসব ক্ষুদ্র কবিতা সংকলনের মধ্য দিয়েই তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন সাবদার সিদ্দিকী, হয়ে উঠেছিলেন সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার নতুন এক কণ্ঠস্বর। তাঁর পরিচয় হয়ে যায় তীব্রভাবে প্রথাবিরোধী এক নাগরিক কবি। প্রথাবিরোধী তো বটেই, সেইসঙ্গে তাঁর স্পষ্টবাদিতা এবং জীবনযাপন নিয়ে উঠতি তরুণ কবিকুলে ছিল বিশেষ কৌতূহল কিন্তু সমসাময়িক ও অগ্রজরা ছিলেন ততটাই উদাসীন। হয়তো বিরক্তও। ফলে মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে কোনো রকম হইচই হয়নি। না এপারে, না ওপারে। অথচ এপার ওপার দু'পারেই ভেসেছে তাঁর জীবননৌকা। জন্ম পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণার বশিরহাটে। পিতা আইনজীবী তাই পরিবারের বসবাস ছিল মহানগর কোলকাতাতে। সাবদার সিদ্দিকীর শৈশব-কৈশোরও কেটেছে সেখানেই। ১৯৬৪ সালের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় বাবা গোলাম মাওলা সিদ্দিকী পুরো পরিবার নিয়ে চলে আসেন সাতক্ষীরায় এবং ১৯৭১ সালে ফের চলে যান কোলকাতায়। সাবদার থেকে যান এবং মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে আট নম্বর সেক্টরে কিছুদিন যুদ্ধও করেন। তারপর ঐসময়েই তিনিও চলে যান ওপারে। তাঁর

মধ্যে যেমন ছিল সেই দাঙ্গার ক্ষত তেমনি তারুণ্যের টগবগে দেশপ্রেমে নতুন একটি দেশের স্বপ্নও। পরে দেখলেন বিপরীত বাস্তবতা। এসব রেখাপাত তাঁর কবিতাকে করেছে শানিত। কোলকাতার দাঙ্গা ও তৎপরবর্তী আন্দোলন-সংগ্রামের প্রত্যক্ষদর্শী তিনি। সেসব উঠেও এসেছে তাঁর 'কোলকাতা, আমি এক তরুণ মহাপুরুষ' শিরোনামের আটাত্তর লাইনের দীর্ঘ কবিতায়।

'মধ্যরাতে দাঙ্গার মাতাল চীৎকার / নিঃসঙ্গ প্রদীপের মতো/ কেঁপে ওঠা আমার কিশোর কোলকাতা/ তুমি কেমন ছিলে ইদানীং/ আজকাল কেমন আছ?/ কোলকাতা তোমার মনে নেই? মনে নেই?/ পঞ্চাশের কোলকাতা?/ দাঙ্গামথিত শহরের বাতাসে ধ্বনিত বিবেকের মতো তোমার, আমার জন্ম চীৎকার?/ কিংবা '৬৪ দাঙ্গামথিত শহরের নগ্নভঙ্গ মৌলালীর উলঙ্গ দরগাহ/ অথবা/ রাজপথে নিঃসঙ্গ সুনীল ভগ্ন শঙ্খের/ নিঃশব্দ নিনাদ?

....

একজন কিশোর মহাপুরুষ/ মায়ের ডাক উপেক্ষা করে/ মায়ের দীর্ঘশ্বাসের মতো বেরিয়ে পড়েছি/ পথে পথে রাজপথে

....

একজন কিশোর/ সমস্ত কোলকাতার/ যাবতীয় রূপ রস বর্ণগন্ধের একচ্ছত্র অধিপতি।/ কোলকাতা, তুমি তাই সুড়ঙ্গগামী আজ/ লজ্জায় লুকাতে চাও তোমার কংকাল মুখ/ লক্ষ লক্ষ-সতীর ভস্মাচ্ছাদিত/ তুমি এক ভণ্ড কাপালিক কোলকাতা।/ প্রত্যহ বিধৌত তুমি তাই গঙ্গাজলে/ তুমি আজ মুখ লুকাতে চাও কোন মুখে?

....

বুক পকেটে চীৎকার নিয়ে/ তোমার যাদুঘরে সংরক্ষিত মমির মতো/ বড়ই নিঃসঙ্গ আমি আজ।

....

হাওড়া ব্রীজ যেন লোহার ব্রেসিয়ার তোমার/ কোলকাতা, যন্ত্রের সমান বয়সী তুমি/ কোলকাতা, তোমার ইতিহাস/ বাইবেলের পিছনে গাদাবন্দুক/ বাংলা গদ্যের সমান বয়সী/ আমার কিশোর কোলকাতা/ সন্ন্যাসীর লিঙ্গের মত নিস্পৃহ তুমি আজ।

....

মিছিলে/ ব্লাডব্যাঙ্কে/ টিয়ার গ্যাসের মুখোমুখি/ তুমি বারবার কেঁদেছ/ আমিও কেঁদেছি কোলকাতা/ ইয়ং বেঙ্গলের হুররে হাহ্‌হা/ কোলকাতা।'

এ যেন কবিতা নয়, একজন কবির জীবনাভিজ্ঞতারই জবানি।

খুব অল্প বয়সে তাঁর মধ্যে ঢুকেছে কবিতার ভূত। তাই প্রতিষ্ঠার হাতছানি উপেক্ষা করে স্বেচ্ছায় বেছে নেন উপেক্ষিত কবিজীবন। কবিতায় তিনি ছিলেন খুবই সমাজ ও রাজনীতিসচেতন। তাই পুঁজিবাদি সমাজ ব্যবস্থার অবক্ষয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক দূর্বৃত্তায়ন, নাগরিক ভণ্ডামি, সাম্রাজ্যবাদি আগ্রাসন, যন্ত্রসভ্যতার ফানুস কিছুই বাদ পড়েনি তাঁর কবিতার বিষয়তালিকায়। বরং প্রতিটি কোণ ধরে শ্লেষমাখা বাক্যবাণে তা হীরকদ্যুতির মতো খুলে দিয়ে গেছে ব্যক্তির অন্ধত্ব, জাগ্রত করে গেছে বিবেক। তাই

মৃত্যু তাঁকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেও সহজে মলিন হবার নয় তাঁর কবিতার তির্যক পঙ্‌ক্তিগুচ্ছ। সে-কারণে দু'দশক পর আবার তাঁকে নিয়ে নতুন করে ভাববার এই চেষ্টা, এই পুনর্পাঠ।

তাঁকে নিয়ে তাঁর মৃত্যুর পরেই ১৯৯৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি 'দৈনিক ইনকিলাব'-এর সাহিত্য সাময়িকী পাতায় লিখেছিলাম, দীর্ঘ লেখা। শিরোনাম ছিল 'কবি সাবদার সিদ্দিকীর মৃত্যু : এক উদ্বাস্তু নগর বাউলের প্রস্থান'। কিছুদিনের সম্পর্কের উষ্ণতায় শ্রদ্ধায় আবেগে ঐ লেখায় তাঁর একটি রেখাচিত্র আঁকার চেষ্টা করেছিলাম : 'দেখতে অবিকল তরুণ সাধু কি সন্তের মতো। লম্বাটে মুখ, ভাঙা চোয়াল, ঈগল ঠোঁটের ন্যায় নাক আর যে কোনো তরুণের মতোই ঘাড় অবধি নেমে যাওয়া একমাথা চুল। মুখে একগোছা পাতলা দাড়ি, গায়ে নামমাত্র মূল্যের তোষকের কাপড়ের আলখাল্লা, পা জোড়া কখনো খালি কখনো বা খড়মে, কখনো বা পরিত্যক্ত টায়ারে তৈরি চপ্পলবন্দি। ক্লান্ত চোখজোড়া কোটরাগত, কিন্তু দূর স্থির লক্ষ্যে আগুনের মতো প্রজ্বলিত। কাঁধে ঝোলা সে তো নিমিত্ত। হালকা-পাতলা ছিপছিপে গড়নের সাদামাটা এ মানুষটি এত তেজ ধরেছিলেন বুকে-মনে। ভাবাই যায় না, যেন তাঁর নির্মোহ আদর্শের কাছে হিমালয় পর্বত পর্যন্ত অবনত।' লেখাটিতে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে তাঁর স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত ও অনমনীয় জীবনচিত্র। অদ্ভুত জীবনচারিতায় তাঁকে তাই মনে হত সাধু কি সন্তের মতোই নির্বিকার ও নির্লিপ্ত এক মানুষ। সে-জীবন ছিল তাঁর কবিতার চেয়েও রোমাঞ্চকর। স্ব-নির্মিত সে-জীবনচারিতায় ছুটে চলাই ছিল তাঁর রুটিন-বাস্তবতা। ফলে জনারণ্যে থেকেও সে ছিল একা, উদ্বাস্তু এক নগর বাউল। ভিড়ের মধ্যে একাকিত্বের সুনীল অবগাহনে ছুটে যেত যেমন সুদূর দিল্লি পর্যন্ত তেমনি নিমগ্নতায় প্রশান্তির খোঁজে যেত পাহাড়ের সান্নিধ্যেও। ভেতরে দারুণ অস্থিরতা, হঠাৎ আত্মমগ্নতা ভাঙলেই তা বুঝা যেত। কিন্তু কী খুঁজত সে তার একাকিত্বের গহনে?

প্রত্যেক কবিই তো ভেতরে ভেতরে একা এবং সেটা তাঁর সৃষ্টিরই প্রেরণা যোগায়। সাবদার সিদ্দিকীর সমসাময়িক প্রয়াত কবি আবুল হাসান তো কবিতায় বলেছেনই, 'অবশেষে জেনেছি, মানুষ মূলত একা।' আর এই একাকিত্ব আবুল হাসানের কবিতাকে দিয়েছে দুঃখের অমল জ্যোতিধারা। তাই তাঁর কবিতার ভেতরে, গভীরে শুধুই দুঃখকষ্ট আর মায়ামমতাভরা। তিনি তাঁর 'ঝিনুক' কবিতায় তা আরও স্পষ্ট করেছেন : ঝিনুক, তুমি নীরবে সহো/ ভিতরে বিষের বালি/ মুখ বুঝে মুক্তা ফলাও। অর্থাৎ একজন কবিকে ঝিনুকের মতোই দুঃখ-কষ্টের ভিতর সৃষ্টির সোনা ফলিয়ে যেতে হবে। কবি সাবদার সিদ্দিকীও মনে করেন, কষ্ট-বেদনা সব মানুষের কাছেই সমান। হোক কবি কিংবা পাঠক, বেদনার কাছে কেউ পৃথক নয়। যেমন– 'মোমবাতি ভাষা ক'জন বুঝতে পারে/ কবি হৃদয়ে ক্ষয়রোগ কিরকম অক্ষয়।/ .... কি রকম কলম কতটুকু ক্ষয়রোগে ভোগে/ ক্ষয়ে ক্ষয়ে কলম তীক্ষ্মতর হলে/ বিদ্ধ সকলেই হয়/ কবি কিংবা পাঠক/ বেদনার কাছে কেউ পৃথক নয়।' [বিনোদিনী চক্ষু হাসপাতাল।]

হাসান ও সাবদার দু'জনের কাব্যবোধ হয়তো কাছাকাছিই ছিল। কিন্তু সাবদারের আবেগ সেখানে অনেকখানি সংযত। যদিও জীবনযাপনে তিনি ছিলেন চরম স্বেচ্ছাচারী। ফলে হাসান তরুণ কবি ও কবিতাপ্রেমী পাঠকহৃদয়ে পেয়ে যান বিশেষ এক আসন।

কবিবন্ধু শামসেত তাবরেজীর মুখে শুনেছি '৭৮ সালের টাঙ্গাইল সাহিত্য সম্মেলনে সাবদারকে দেখা গেছে জিন্সের প্যান্ট-শার্ট এবং চোখে চশমাপরা পুরোদস্তুর এক আধুনিক যুবক। তবে ভেতরের কোন্ আন্দোলনে বিস্ফোরিত হয়ে তুমুল তারুণ্য থেকে তাঁর এই বিচিত্র রূপধারণ। এ কি তাঁর নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা, না রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ! তাঁর এই অদ্ভুত বেশে কেউ কেউ তাঁকে মনে করত উন্মাদ নয়তো ছন্নছাড়া। কিন্তু মুখ থেকে যখন গরগর করে বেরিয়ে আসত বিশুদ্ধ বাংলা ও ইংরেজি এবং চোখের চশমা সরালে জ্বলে উঠত দুটি দীপশিখা তখন টের পেত মানুষটার ভেতর রয়েছে অন্যরকম এক তেজ। এই তেজ তাঁর জীবনাভিজ্ঞতার এবং তিক্ততার। ফলে যৌবনের উষালগ্নেই যে তাঁর মধ্যে জায়গা করেছিল বারুদের মতোই স্বাধীনচেতা এক মনোভাব, যুদ্ধোত্তর স্বাধীন দেশে নিজের নাম থেকে 'গোলাম' শব্দটি ছেটে দিয়ে তিনি তা বুঝিয়ে দেন। এ ছাড়া 'যে কবির কবিতা নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া যায়' শিরোনামে তাঁর ছোঁট্ট এক গদ্যলেখার মধ্যে আমরা টের পাই ভেতরে ভেতরে তাঁর অঙ্কুরিত হচ্ছিল লাতিন আমেরিকার জগৎবিখ্যাত কবি পাবলো নেরুদার বিপ্লবী চেতনার বীজ। হয়তো সেই বীজমন্ত্রের আকর্ষণে বাঁধা পড়ে যাওয়ায় কবিজীবনের শুরুতেই স্বপ্ন দেখতেন শোষণমুক্ত মেহনতি মানুষের এক শান্তিবিশ্ব! নইলে খরাপীড়িত ইথিওপিয়ার মানুষের প্রতি সমবেদনায় তিনি সেখানে ইরি চাষের স্বপ্ন দেখবেন কেন?

'পাবলা নেরুদা তাই শুধু তাঁর বিপ্লবী চেতনার প্রেরণাই ছিল না, ছিল কাব্যাদর্শও। দুনিয়াকাঁপানো বিপ্লবী গেরিলা নেতা চে' গুয়েভারা যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বক্ষণ সঙ্গে রাখতেন নেরুদার কবিতার বই।

কবি সাবদার সিদ্দিকী এই দুই মহৎ প্রাণের চেতনাই বহন করেছেন হৃদয়ে। তাই জীবনের মধ্যে খুঁজতেন অন্য এক জীবন এবং সমষ্টির প্রতিধ্বনি। তাঁর এই উপলব্ধি সেই ইঙ্গিতই তো দেয় : 'অক্ষরগণ শব্দ হন/ শব্দগণ বাক্য হন।/ ব্যাকরণ ধ্বনি হন/ ধ্বনিগণ হন প্রতিধ্বনি।

এই যূথবদ্ধ ভাবনা, জীবনের কোরাস তাঁর মর্মে মর্মে, চিন্তায় ও মগজে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত এবং উপলব্ধিগত বলেই 'ওয়াকিটকি' কবিতায় তিনি একজন কমরেডের মতোই উচ্চারণ করেন, 'আলো জ্বালতে এসে ভুলে/ আগুন ফেলেছি জ্বেলে।' তাঁর কবিতায় তখন মুক্তিসংগ্রামে লড়াকু কোনো গেরিলার ছবিটি যে এভাবেই জীবন্ত ফুটে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। 'শিরোনামহীন' কবিতার পঞ্চম ছত্রে তাই দেখি :

'পরিণত হাত যখন হাতিয়ারে/ সময়ের ধার তখন কে রে ধারে/ এ ধারে ও ধারে/ ঘুমায়ে পড়েছে কে রে? / রেখে মাথা ঘাস বাংকারে/ তর্জনী রেখে ট্রিগারে?'

যে জীবনই সাবদার যাপন করে যান না কেন তাঁর ভেতরে ছিল বিপ্লবের স্পন্দন, ছিল চোখে স্বাধীনতার স্বপ্ন। তাই তিনি কবিতায় সঞ্চারিত করেন এই বোধ :

‘প্রত্যেকটি কবিতাই যেন/এক একটি স্বাধীনতার সনদ।/ প্রত্যেকটা কবিতাই যেন/ পোস্টারে উৎকীর্ণ/ আগ্নেয় ভাষা।/ প্রত্যেকটা কবিতাই যেন/ মিছিলে উচ্চারিত/ প্রতিবাদের ভাষা/ প্রতিরোধের ভাষা।/ প্রত্যেকটা কবিতাই যেন/ স্বাধীনতার ভাষা।’ [প্রত্যেকটা কবিতাই যেন]

তাঁর ‘টেলিগ্রাম টেলিগ্রাম’ শিরোনামের কবিতায় সেই আহ্বান আরও উচ্চকিত :

‘টেলিগ্রাফের তার/ যেন রবিশংকরের সেতার/ সুরের মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় / টক্কা টরে টক্কায়/ টরে টক্কায় বলে যায়/ ডাক দিয়ে যায়,/ আয় ওরে আয় আয়/ আয় নারী/ আয় বিপ্লবের ব্রহ্মচারী।’

বিপ্লবী না ব্রহ্মচারী এ দু’য়ে বিভক্ত হয়ে গেছে তাঁর কবিসত্তা। আর এই দ্বৈত সত্তার ওপর একটা তুলনামূলক আলোচনাই এ লেখার উদ্দেশ্য। সেখানেই তাঁর বাঁকফেরা নতুন জীবন। বিপ্লবের প্রশ্নে তিনি আজীবন মুক্তিযোদ্ধা, অন্তহীন সংগ্রামী। কিন্তু ব্রহ্মচারী– আন্দোলিত জীবন গুটিয়ে নিজের নিভৃতে পলায়ন। ফলে যে তেজ ও অঙ্গীকার নিয়ে তাঁর শুরু, তাঁর শেষ না দেখেই অর্থাৎ চূড়ান্ত পরিণতির দিকে না গিয়েই তিনি পিছু হটেন। বিপ্লবী ও ব্রহ্মচারী এক অর্থে আবার অভিন্ন, উভয়েই ঘরহীন। ঘর থাকলেই নারী ও সন্তান, থাকে পিছুটান।

ব্রহ্মচারী তথা বাউলিয়ানায় সেসবের বালাই নেই, সে এক আত্মনিমগ্ন জীবন। অবশ্য সাধনার জন্য তার কোনো বিকল্প নেই।

এই জন্যই সাবদার বিপ্লবের ব্রহ্মচারী, অমীমাংসিত তাঁর জীবন। যাঁর কবিতা সমাজের অশনি সংকেতে এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করে গেছে, ‘কলম ও বন্দুক সমমন/ কানের ও মনের/ রাখিও যতন।’

যিনি জাতির দিকনির্দেশনায় একমাত্র ভরসা বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থের কাছে বিবেক বিকিয়ে দেয়াকে ইঙ্গিত করে বলতে পারেন ‘কলম ভাড়া দেব না’।

সেই অগ্নিপুরুষ যদি বলেন, ‘মনটারে তুই কর/ পাথর/ দেহটারে মাটি/ চোখে চোখে সরোবর।’

তখন আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না সত্যিই তাঁর মধ্যে ঘটেছে আমূল পরিবর্তন। সেই জীবনভাটার জন্যই তাঁর মধ্যে এই সুরের ভাটিয়ালি টান।

ফলে আমরা বলতেই পারি কবি সাবদার সিদ্দিকীর মৃত্যু আসলে প্রকৃত অর্থে এক নগর বাউলেরই প্রস্থান।

[লেখক: কবি। প্রাবন্ধিক। সম্পাদক, ছোটকাগজ ‘খেয়া’।]